কাফেলা

সৈয়দা মোতাহেরা বানু

সঙ্কলন ও সম্পাদনা
অমলেন্দু দে

প্রা স্তি ক
ক লি কা তা - ৭ ০ ০ ০ ৩৬

প্রকাশক : সুকুমার চৌধুরী
প্রাস্তিক
২৬৫/এন, গোপাললাল ঠাকুর রোড
কলিকাতা-৩৬

প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৪

মুদ্রণ : শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক
শঙ্কর প্রেস
৩৭/১/১, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান :
সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

দি বুক হাউস
১৫, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

বাঙালী জীবনের লোক সংস্কৃতির ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার অনলস সাধনায় রত বাংলাদেশের বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক পরমশ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মুহম্মদ মনস্থর উদ্দীন মহাশয়ের করকমলে

ভূমিকা

পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর ১৭ এ দিলখুসা স্ট্রিটের বাড়ি। তার দোতলায় বসবার ঘরের পরদা সরিয়ে যে মহিলা তাঁর মেয়ে ছবির (তাহমিনা বানু) সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে আমার মনে হল সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। আমি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলাম তিনি স্মিতমুখে আমাকে বললেন, 'বাবা, তুমি বসো'। ১৯৪৯ সালে তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করছি। সেই প্রথম শ্রদ্ধেয়া সৈয়দা মোতাহেরা বানুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। আমি তাঁকে মাতৃসম্বোধন করলাম। তিনি আমাকে আপন সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। এই সম্পর্ক যতদিন তিনি মর্ত্যলোকে ছিলেন অব্যাহত ছিল। তাঁর চরিত্রে কোমলতা ও কঠোরতা মিশে ছিল। কোমলতার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই, যক্ষারোগে আক্রান্ত বড়ো মেয়ে লিলি যখন যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে ছিল তিনি বোরখা ত্যাগ করে ট্রামে-বাসে গিয়ে তাকে খাবার দিতে আসতেন। কোনো নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ করেননি। লিলি রক্ষা পায়নি। আবার ১৯৪৬ সালে ১৬ আগষ্ট দাঙ্গার সময় ডাঃ সান্ন্যালের পরিবারকে অসম সাহসিকতায় নিজের ফ্ল্যাটে স্থান দিয়ে উন্মত্ত জনতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন।

কিন্তু তিনি যে কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর রচিত গান যে সেকালের জনপ্রিয় দুর্লভ কণ্ঠের অধিকারী কে. মল্লিক গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরে রেখেছিলেন সে খবর আমি জানতাম না। আমরা যাঁদের কবিতার সঙ্গে ছাত্রজীবনে পরিচিত ছিলাম তাঁদের মধ্যে বেগম শামসুন্ নাহার এবং সুফিয়া কামাল-এর নামই ছিল উল্লেখযোগ্য। মোতাহেরা বানুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কয়েকদিন পর দিলখুসা স্ট্রিটের ঐ বাড়িতে ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি চা পান শুরু করার আগে বললেন: 'আপনার মধ্যে অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কেন? আবার লিখুন।' তখন আমি তাঁর কবিতা রচনা ও প্রকাশের কথা জানতে পারলাম। অনেকটা জোর করে কিছু কবিতা পড়লাম ও বিস্মিত হয়ে গেলাম। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র তের

বৎসর বয়সে বিবাহিতা, বহু সন্তানের জননী, বরিশালের গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের কন্যা ও বধূ লিখতে পারেন :

তুমি করগো আমায় বধির তোমার
অধীর বাঁশরী বাজায়ে,
এস হৃদি-কদম্বে শিহরণ তুলি
হিয়ার যমুনা নাচায়ে।

বাংলা দেশের রাধাকৃষ্ণ কথা অবলম্বনে রচিত পদাবলী গানের চিরন্তন কথা ও সুর এই 'অধীরা' কবিতাটিতে সঞ্চারিত। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ তার গীতি কবিতা। বিংশ শতকেও উজ্জ্বল ঐতিহ্যরূপে তার উপস্থিতি বাংলা গীতি কবিতা ও গানে অনুভূত। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গানে ও কবিতায় তার প্রকাশ আমরা নানারূপে দেখি। আমাদের কবি যখন কবিতা শেষ করেন আকুল আত্মনিবেদনে—

রাজা হে!
যত ভূষণ আমার হ'রে নিয়ে দাও
তোমার বসনে সাজায়ে,—
ওগো করগো আমায় বধির তোমার
অধীর বাঁশরী বাজায়ে!

সেই মুহূর্তে আমরা এর সহজ সৌন্দর্য ও নিবিড় আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই। মুগ্ধ হই অকৃত্রিমতায়। কবিতার প্রাণ অকৃত্রিম বিশ্বাসে। সেই বিশ্বাস মোতাহেরা বানুর ছিল। তাঁর হৃদয়ে কোনো সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ঈশ্বরকে প্রিয়রূপে দেখেছেন, 'রাজা' বলে সম্বোধন করেছেন (যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথে), তাঁকে কোনো বিশেষ গণ্ডিতে বাঁধেননি. হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য সাজিয়ে তাঁরই জন্য অপেক্ষমানা। সেখানেই 'চির-বাঞ্ছিত' কবিতাটির সর্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদন :

কালিমা হৃদের ঘুচাও দয়িত
হিরণ তোমার কিরণে ;
ভুলে থাকি যদি —জাগায়ো আঘাতে
নয়নের ঘুম হরণে।
বেদন দিয়ো গো, নিয়ো গো প্রিয় গো,
শরণ দিয়ো গো চরণে,
হে রাজা আমার, চির-বাঞ্ছিত
জীবনে আমার মরণে।

—এর মধ্যে রবীন্দ্র প্রভাব স্বতঃই লক্ষণীয়, কিন্তু সেখানেই এর বৈশিষ্ট্য, কেননা রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ কোন স্তর পর্যন্ত সেকালে ঘটেছিল সেটা বুঝতে পারি।

কিন্তু শুধু প্রেম ভক্তির কবিতা নয়। আমাদের বাঙালী সমাজে বাল বিধবাদের বেদনাহত বিবর্ণ জীবনের করুণতাও তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন :

সাধের যামিনী পোহাল তাহার
না কহিতে দুটি কথা
ডুবিল চাঁদিমা অমার সাগরে
জাগিয়া রহিল ব্যথা। (বালবিধবা)

মোতাহেরা-র কবি-জীবনের প্রথম পর্বের আলম্বন প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। বাংলা গীতি কবিতার এই ত্রিপথগা গতি তাঁর রচনায় বহমান। প্রস্থিত প্রেমের সকরুণ স্মৃতি ফুটে উঠেছে 'স্মরণে' বা 'বাদল রাতে' কবিতায়—

সেদিন ঐ তরুতলে
বসিয়ে জ্যোছনা জালে
সিক্ত নয়ন তুলে—
ডাকিল কাছে।
আমি আসি আসি বলে,
যাতনা দিয়েছি হেলে,
বুঝিনি সে মঞ্জু ফুলে—
কি সুধা আছে।

অথবা—

এ বাদল বরিষণে কে আমায় যাচিল
আকুল হিয়ার বনে
দেয়া-ঢাকা উষাখনে,
কাহার কাজল-আঁখি ঝর ঝর ঝরিল।

এ সব কবিতার মৃদু-মধুর স্পর্শ সাম্প্রতিক কালের কবিতায় না থাকলেও সেকালে খুব বেশি ছিল। তাই উদ্ধৃত অংশগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কণ্ঠ অশ্রুত থাকে না। 'বউ কথা কও' কবিতাটি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কোনো প্রখ্যাত কবির রচনা হিসেবে স্থান পেতে পারে। বাংলা দেশের

পাখির এই ডাকটিকে নিয়ে অনেকেই কবিতা রচনা করেছেন, মোতাহেরার এই কবিতাটিকে সেই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি :

'বৌ কথা কও বৌ কথা কও' গান
আর কত কাল গাইবি বনের পাখী।
ব্যথায় ব্যথায় আকাশ হল নীল
বাতাস কেঁদে দোলায় তরুর শাখী
*　　　*　　　*
অকরুণী কইবে না আর কথা,
শুনবে না তোর মধুর মর্মধ্বনি
বৌ কথা কও, বৌ গো'কথা কও—
বিশ্বে এ গান রইবে চিরন্তনী।

আমি যখন তাঁর স্নেহের পাত্র হই তখন তাঁকে কবিতা লিখতে আর বড়ো দেখিনি। চার মেয়ে, দুই ছেলে, স্বামী— সকলের সব দায়িত্ব অম্লানবদনে নিজে তুলে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বাসকালের শেষের দিকে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে ঈষৎ দুর্বলতা দেখা দেয়। তারপর শ্রদ্ধেয় ইউসুফ সাহেব পরলোকের যাত্রী হলেন। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে তাঁরা পূর্ববঙ্গে (পূবপাকিস্তান, পরে স্বাধীন বাংলাদেশ) চলে যান। সেখানে তিনি নতুন করে আবার কবিতা রচনায় হাত দিলেন। নানা ধরণের কবিতা লিখলেন, শিশু কবিতা, আশীর্বাদী কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক ছড়া। লিখলেন স্বাধীন বাংলা দেশের মুক্তি সেনাদের উদ্দেশে— লিখলেন অন্তরের গভীর থেকে উঠে-আসা এমন কবিতা যা রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

তাহলে চামচ-কাঁটা
ধরতে হবে ;
পুষি নাম ছেড়ে তবে
সাহেব হবে।
নিতে হবে সাহেবি
• ট্রেনিং
ইংলিশে বলতে হবে
গুড্ মর্নিং। (মার্জার সংবাদ)

অথবা—

মনের মুকুরে
তোমার কথা মনে পড়ে।

দুপুরে কিংবা রাতের অন্ধকারে—
রোদ নিভে-আসা
বিষণ্ণ বৈকালে
মন শুধু তোমাকে খুঁজে ফেরে। (খুঁজে ফিরি)

কিন্তু কবি হিসাবে তিনি সেইখানে মহৎ, যেখানে তিনি মর্ত্যমানুষের জীবনের জয়যাত্রার সঙ্গী, অথবা পাকিস্তানী বন্ধন পাশ ছিন্ন করবার জন্য যে মৃত্যু পাগল যুবক-যুবতী—বাংলা দেশের মাটিতে রক্ত ঢেলে দিয়েছিল তাদের সেলাম জানিয়ে তিনি রচনা করেন অমর সেই কবিতা— 'লাখো সালাম'।

আর যদি কোনো দিন
তোমাদের দেখা নাহি পাই,
ধরণীর ধূলি মাঝে।
মিশে যদি ধুলে হয়ে যাই,
তবু তোমাদের পথে
জ্বেলে যাব কল্যাণ-দীপিকা ;
লিখে যাব দীপ্ত ভালে
অমেয় প্রাণের জয়টিকা। (বিদায়ী কাফেলা)

বেশি লিখে লাভ নেই। কাব্য রসিকেরা এই কবিতা সংগ্রহকে বিনত শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়বেন, বিশ্বস্ত অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করবেন এ-সম্পর্কে আমার বিশ্বাস দৃঢ়মূল।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

নিবেদন

অনেককাল আগে সৈয়দা মোতাহেরা বানু (১৯০৬-১৯৫৩) কাব্য চর্চা সুরু করলেও আজ পর্যন্ত তাঁর কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হয়নি। এই অভাব পূরণের উদ্দেশেই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হল। আমি কবির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য 'জীবনী ও বংশ পরিচয়' অধ্যায়ে দিয়েছি। তাই এখানে শুধু সঙ্কলন ও সম্পাদনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি।

এই কাব্য গ্রন্থের কোন কোন কবিতা পাঠ করে মনে হবে কবি যেন আত্মগতভাবে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলছেন। একই বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি কয়েকটি কবিতায় পাওয়া যায়। তাছাড়া কোন কোন কবিতার শিরোনামা ও সময়কাল কবি উল্লেখ করেননি। তাঁর চিন্তার সূত্রগুলো যাতে বোঝা যায় এই কারনে আমি তাঁর কোন কবিতাই বাদ দেইনি। আর কিছু কিছু কবিতার শিরোনামাও আমাকেই দিতে হয়। যদিও ঢাকায় তাঁর অবস্থানের কথা (১৯৫৫-১৯৫৯) মনে রেখে কবিতাগুলোকে এখানে সাজানো হয়েছে, তবুও আশঙ্কা হয়, কোন কোন কবিতা হয়তো সময়কাল অনুযায়ী যথাস্থানে রাখা সম্ভব হয়নি।

আমি গত তিন-চার বছরের প্রচেষ্টায় এই সমস্ত কবিতা ঢাকায় বিভিন্ন লাইব্রেরীতে রক্ষিত পত্র-পত্রিকা ও কবির কন্যাদের নিকট হতে সংগ্রহ করেছি। কবির জামাতা প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটোর টেলিভিশন উপকেন্দ্রের আঞ্চলিক অধিকর্তা মোহাম্মদ জাকারিয়া ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী তাহমিনা বানু এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেন এবং আমার অনেক উপদ্রব সহ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সাহায্যের ফলেই এই কাজ আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হল। ঢাকায়-থাকাকালীন কবির নিত্যসঙ্গী ছিলেন তাঁর চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী শামিমা বানু। কবি বিভিন্নসময়ে বিক্ষিপ্তভাবে কাগজের টুকরায় যে সব কবিতা রচনা করেন তা শামিমা যত্ন সহকারে রেখে দেন। তাই কবির অনেক অপ্রকাশিত কবিতা রক্ষা পায়।

'সওগাত' মাসিক পত্রের সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এবং 'বেগম' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী নূরজাহান বেগম তাঁদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ও কাগজের পুরানো ফাইল আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে যথেষ্ট

সাহায্য করেন। ঢাকার বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনেক পত্র পত্রিকা আমাকে দেখতে দেন। তাঁদের কাছ থেকে এই সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে এই কাজে অগ্রসর হওয়া কষ্টকর হত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর অনেক কাজের মধ্যেও সময় করে এই গ্রন্থের জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

কলকাতার মুরলীধর গার্লস কলেজের বাংলার অধ্যাপক কবি সুধীর গুপ্ত গ্রন্থখানির কবিতা সমূহের পাণ্ডুলিপি যত্ন সহকারে পাঠ করে এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। যাদবপুর সম্মিলিত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী রেণু গুপ্ত কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয় ভূষণ রায় গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাকে উৎসাহিত করেন।

প্রকাশক শ্রীসুকুমার চৌধুরী আগ্রহ করে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রন পারিপাট্যের সমস্ত কৃতিত্বই শঙ্কর প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের।

অনেক সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি মুদ্রণ ত্রুটি থেকে গেলো, এই জন্য পাঠকদের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করছি। এই গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদনা করার ব্যাপারে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

অমলেন্দু দে

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	মুসলনান	মুসলমান
১২	চয়োনা	চেয়োনা
১৪	বেপে	ব্যেপে
২২	শির্ষে	শীর্ষে
৩২	শারাবের	শরাবের
	লজ্জ্বা	লজ্জা
৬১	হিরের	হীরের
৭৯	বেলা বনে	বেনা বনে
৯১	বিষম্ন	বিষণ্ণ
	খুজে	খুঁজে
৯৫	নুতনের	নূতনের
১১৩	অশরীরি	অশরীরী
১১৬	সায়াহ্নের	সায়াহ্নের
	বিষন্ন	বিষণ্ণ
	শীলাতলে	শিলাতলে
১১৯	লাখো সলাম	লাখো সালাম
১৪৩	স্তধু	শুধু
১৪৪	সবকুটু	সবটুকু
১৪৬	দিমগুলি	দিনগুলি
১৪৮	আস্তে	আস্তে
	যায়	যায়
	যেতে	যেতে
	বয়েছেন	রয়েছেন

জীবনী ও বংশ পরিচয়

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বরিশাল জেলার বামনা গ্রামে মোতাহেরা বানু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতামহ মীর সারওয়ার জান বামনার জমিদার ছিলেন। এই মাতামহের বাড়িতেই মোতাহেরার জন্ম হয় এবং তাঁর বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এখানেই আদর-যত্নে লালিত হন। পিতৃকুলের দিকে মোতাহেরা ছিলেন খ্যাতনামা পীর বংশের সন্তান। মোতাহেরার পিতা শাহ সৈয়দ সাজ্জাদ মোজফ্‌ফর ফরিদপুর শহরের নিকটবর্তী গট্টি নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সাজ্জাদের পিতা শাহ সৈয়দ আবদুর রহমান এক বড় জমিদার ছিলেন। হাভেলী পরগণায় তাঁর জমিদারী ছিল। কিন্তু শাহ সৈয়দ আবদুর রহমানের আমলেই এই জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য পীর বংশ হিসেবে কৌলিন্য থাকায় এই পরিবারের এক বিশেষ মর্যাদা ছিল। জমিদারী হাতছাড়া হয়ে যাবার পরেও তা অটুট থাকে।[১]

গট্টির এই পীর পরিবারের ইতিহাস লক্ষণীয়। আবদুর রহমানের পূর্বপুরুষ ছিলেন আরব দেশের বিখ্যাত পীর। তাঁরা ত্রয়োদশ শতকে হুলাগু খানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাগদাদ পরিত্যাগ করে সুদূর চট্টগ্রামে চলে আসেন।[২] চট্টগ্রামের যে স্থানে তাঁরা এসে বসতি স্থাপন করেন তা 'বাজে বোস্তাম' নামে পরিচিত।[৩] এখানেও তাঁরা শান্তিতে সাধন-কার্য পালন করতে পারেননি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আরাকানের মগদের অত্যাচারের ফলে তাঁরা চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে ফরিদপুর জেলার গট্টি

গ্রামে বসবাস শুরু করেন।[৪] তাঁরা বাদশাহের পীর ছিলেন। শাহস্জা (১৬৩৯—১৬৬০খ্রী) তাঁদের জমিদারী দান করেন।[৫] এই জমিদারীর জন্য তাঁদের কোন খাজনা দিতে হত না। এইভাবে এই বংশের পূর্বপুরুষেরা গড়িতে পীর ও জমিদার উভয় পদেই অধিষ্ঠিত হন।[৬]

মোতাহেরার পিতামহ আবদুর রহমানের পিতার নাম ছিল শাহ গোলাম কাজেম। শাহ গোলাম কাজেমের মেজোভাই শাহ গোলাম আজেম ছিলেন বিখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২ খ্রী)-এর ভগ্নিপতী। স্বভাবতই মীর মশাররফ হোসেনের পরিবারের সঙ্গে মোতাহেরাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[৭] দুটো কারনে মোতাহেরার পিতামহের জমিদারী নষ্ট হয়ে যায়। শাহ গোলাম আজেমের বংশধরেরা জমিদারী থেকে আয় গ্রহণ করতেন, কিন্তু খাজনা দেবার ব্যাপারে কোনই দায়িত্ব নিতেন না।[৮] আবদুর রহমানকেই খাজনার বোঝা বহন করতে হত। এই অবস্থায় আবদুর রহমান ক্ষুব্ধ হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং ইচ্ছা করেই জমিদারী নষ্ট করে দেন। তাছাড়া যখন থেকে তাঁরা 'আমিরী' শুরু করেন তখন থেকেই তাঁরা পীরের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁরা পুরো 'দুনিয়াদার' হয়ে পড়েন। ফলে ধীরে ধীরে জমিদারী নষ্ট হয়ে যায়।[৯]

শাহ গোলাম আজেম নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী সাঁওতা গ্রামে বসবাস করতেন। এখান থেকেই তাঁর নিজের জমিদারী দেখাশুনা করতেন।

এই সাঁওতা গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রেরও (১৮২৮-১৮৭৩ খ্রী) বাসস্থান ছিল। দুজনের মধ্যে খুবই অন্তরঙ্গতা হয়। শাহ গোলাম আজেম ভালো করে বাংলায় লিখতে পারতেন না। উর্দু ও ফারসী ভাষাতেই তাঁর বেশী দখল ছিল। তিনি দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলা ভাষায় নীলকরের অত্যাচার উদ্ঘাটিত করতে বলেন। আর তিনি নিজে গ্রামের লোকদের সংগঠিত করে নীলকর সাহেবদের দমন করতে সচেষ্ট হন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে নীলকর সাহেবদের সংঘর্ষ বাধে। তিনি মাঝে মাঝে নীলকর সাহেদের মারধোর করতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। গোলাম আজেমের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে নীলকর সাহেবেরা তাঁকে যথেষ্ট ভয় করতে শুরু করে এবং তাঁর সঙ্গে আপোষ করে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি নীলকর সাহেবদের স্পষ্ট করে বলে দেন: 'তোমরা আমাদের দেশ থেকে চলে যাও।'[১০]

অন্যদিকে শাহ গোলাম কাজেম গটিতে থাকতেন। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আর তিনি ছিলেন পীর। তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও, বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করেন। তিনি বাংলাতে বেশ ভালোভাবেই লিখতে পারতেন। তাঁর গায়ের রং ছিল দুধে-আলতায় মেশানো। তাই তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে 'লাল কাজেম' বলে ডাকতেন। তাঁর পুত্র আবদুর রহমানও খুবই ফর্সা ছিলেন। তিনি উচ্চতায় মাঝারী ধরনের ছিলেন। আবদুর রহমানের স্ত্রীও খুবই ফর্সা ছিলেন। আবদুর রহমান আরবী, ফারসী ও উর্দু খুবই ভালো জানতেন। তাছাড়া বাংলাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি কিছুটা ইংরেজিও জানতেন। তাঁর স্ত্রীও উর্দু ও বাংলা ভাষায় ভালো করে লিখতে ও পড়তে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আমলেই 'আমিরী' শুরু হয় এবং জমিদারী নষ্ট হয়। জমিদারী আয় থেকেই তাঁর চলত। তিনি অন্য কোন কাজ-কর্ম করতেন না। তাঁর বাড়িতে পর্দা প্রথা ছিল।[১১]

আবদুর রহমানের শ্বশুর মৌলবী আদিলুদ্দীন কোম্পানীর আমলের জজ ছিলেন। তেলিহাটি পরগণার নারায়ণপুরে আদিলুদ্দীনের নিবাস ও জমিদারী

ছিল। আদিলুদ্দীন সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বছর ধরে পেনসন ভোগ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বিশ্বাস করতে চাননি যে, আদিলুদ্দীন এতদিন জীবিত থেকে পেনসন গ্রহণ করছেন। তাই ফুলার সাহেব যখন বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ফরিদপুর শহরে আসেন তখন তিনি আদিলুদ্দীনকে দেখতে চান এবং তাঁকে ডেকে পাঠান। আদিলুদ্দীন নারায়ণপুর থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে ফরিদপুরে ফুলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং ফুলার সাহেব তাঁকে দেখে হেসে ফেলেন। তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করতেই আদিলুদ্দীন বলেন যে, তাঁর বয়স ১২২ বছর হয়েছে এবং তিনি সোজা হেঁটেই এসেছেন। তখন খুশি হয়ে ফুলার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন 'তুমি আমার কাছে কি পুরস্কার চাও?' আদিলুদ্দীন সঙ্গে করে তাঁর নাতি সৈয়দ সাজ্জাদ মোজফ্‌ফরকে নিয়ে যান। তিনি নাতির জন্য একটি চাকরি প্রার্থনা করেন তখন ফুলার সাজ্জাদ মোজফ্‌ফরকে সি আই. ডি. ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। তখন ছিল জোর স্বদেশী আমল।[১২]

মোতাহেরার পিতা সাজ্জাদ মোজফ্‌ফর আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি জানতেন। তাঁর আমলে আর তাঁদের জমিদারী ছিল না। তিনি বরিশাল শহরে ও কলকাতায় পড়াশুনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন নারায়ণপুর গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের টোলে। কুঞ্জবিহারীর সঙ্গে আদিলুদ্দীনের গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। আদিলুদ্দীন তাঁর গ্রামের এই সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কুঞ্জবিহারীর একমাত্র পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে কুঞ্জবিহারী আর টোল চালাতে কোন উৎসাহ পাননি। তারফলে টোলটি বন্ধ হয়ে যায়। তাতে আদিলুদ্দীন গভীর বেদনা অনুভব করেন। মোতাহেরাও কুঞ্জবিহারীকে দেখেন। মোতাহেরার যখন পনেরো ষোল বছর বয়স তখন তিনি 'খোলামকুঁচি' শব্দের অর্থ জানতে কুঞ্জবিহারীর নিকটে যান। কুঞ্জবিহারী তাঁকে বলেন, 'অভিধানে এই শব্দ নেই, এটি আঞ্চলিক শব্দ। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বলেন। তুমি তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আমি ঠিক জানিনা।' পরে বামনাতে হাওড়ার সালকের অধিবাসী

১২ ঐ

এক ভদ্রলোক এসে তাঁর নিকট হতে মোতাহেরা এই শব্দের অর্থ জানতে পারেন।[১৩]

সাজ্জাদ মোজফ্‌ফর চাকরিতে খুবই দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে তিনিই ধরেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আহমদ কনস্টেবল। অবশ্য পরে নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হন এবং আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন। কিন্তু সাজ্জাদ মোজফ্‌ফর সরকারী চাকরিতে বেশীদিন থাকতে পরেননি। সরকারী চাকরি করলেও রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাঁর মনে এক আলোড়ন তোলে। তিনি এক রাজনৈতিক আসামীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সেই রাজনৈতিক কমা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 'তোরা ইংরেজের কুকুর। তোরা না হলে কি আমাদের ধরতে পারে।' এইকথা শুনে সাজ্জাদের মনে গভীর দুঃখ হয় এবং তিনি সেই রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকেন। এই ঘটনার পরেই তিনি সি. আই. ডি ইনস্পেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দেন।[১৪]

সাজ্জাদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সময়ে তিনি বেশীর ভাগ সময়ই বামনাতে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। শ্বশুর জীবিত থাকাকালীন তাঁর পিতার বাড়ি থেকে কন্যাকে নিয়ে যেতে পারবে না এই সর্তে সাজ্জাদের সঙ্গে মীর সারওয়ার জানের কন্যার বিবাহ হয়। কিন্তু এই সর্ত সাজ্জাদের মনঃপুত ছিল না। তাই তিনি মনে বড় দুঃখ পেতেন এবং বলতেন, 'আমার পিতা কেন এই সর্তে বিবাহ দিলেন।' বামনাতে থাকার সময়ে মাঝে মাঝে শ্যালকদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হত এবং কখনও কখনও তিনি রাগ করে শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে যেতেন। মেজো শ্যালকের সঙ্গে অবশ্য তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। বামনার এই জমিদার বাড়িতে থাকার সময়ে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা কয়েকটি গ্রন্থে রূপদান করেন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ বাংলাতে লেখেন। তার মধ্যে 'মিলাদ শরিফ' ও 'বামনা রহস্য' নামক দুখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়। তিনি অসংখ্য কবিতা ও ছড়া রচনা করেন। এইসব অপ্রকাশিত রচনা যখন

---

১৩ ঐ

১৪ ঐ

প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল তখন বামনার যে ঘরে পাণ্ডুলিপিসমূহ রক্ষিত ছিল তা আগুন লেগে পুড়ে যায়। 'বামনা রহস্য' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি খুবই বৃহৎ ছিল। বামনার ইতিহাস ও সমাজ জীবন ছিল এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। কিভাবে মগেরা ও পর্তুগীজেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বরিশাল জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, এইসব বিষয়ে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে ছিল। সাজ্জাদ লখেন, মগেরা ও পর্তুগীজেরা উচ্চবংশের মুসলমান মেয়েদের বিবাহ করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে। লক্ষণীয় এই যে, পর্তুগীজেরা মুসলমান হবার পরেও সরাব খেত। তাছাড়া এই গ্রন্থে বহু বিবাহের কুফল নিয়েও অনেক কথা লেখা ছিল।[১৫]

মোতাহেরার মাতামহ মীর সারওয়ার জান মোট পাঁচবার বিবাহ করেন। তিনি এক পর্তুগীজ কন্যাকেও বিবাহ করেন। পর্তুগীজ-মুসলমানেরা খুবই লম্বা, ফর্সা ও সুন্দর দেহের অধিকারী ছিল। বরিশাল জেলায় এই ধরণের পর্তুগীজ-মুসলমান কিছু সংখ্যক ছিল। মোতাহেরার তাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। বাংলায় পর্তুগীজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাহিনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘটে অল্প বয়সেই। তাই অনেককাল পরে তিনি যখন কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তাদের কথা পড়েন তখন গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন।[১৬] মাতামহের বাড়ির একটি করুণ কাহিনীর সঙ্গে

মোতাহেরার জীবনও জড়িত। তাঁর মাতামহীর যখন কন্যা হয় তখন তাঁর দুজন সতীন ষড়যন্ত্র করে কন্যা হবার সময়ে তাঁকে মেরে ফেলেন। তিনি কন্যার জন্মের খবর জেনে যেতে পারেননি। সুতরাং মোতাহেরার মাতা জোবায়দা বানু (ডাক নাম ছিল জবা) জন্মলগ্নেই তাঁর মাতাকে হারান। মীর সারওয়ার জান জোবায়দার নাম রাখেন হামিদুন্নেসা খাতুন। জোবায়দার মামা তাঁর নাম জোবায়দা রাখেন। তাই মোতাহেরার মাতা এই দুই নামেই পরিচিত ছিলেন। জন্মের পরেই জোবায়দাকে তাঁর বড়মামা মহিষপুরায় (ফরিদপুর জেলায়) নিজের কাছে নিয়ে রাখেন। ওখানেই জোবায়দা বড় হন এবং সাত বছর বয়স পর্যন্ত থাকেন। তারপর মীর সারওয়ার জান জোর করে কন্যাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে বামনাতে রাখেন। যে সাত বছর জোবায়দা মহিষপুরায় মামাবাড়িতে ছিলেন সেই সাত বছর মীর সারওয়ার জান কন্যার ভরন-পোষণের জন্য প্রতিমাসে অনেক টাকা পাঠাতেন। জোবায়দা অল্প বয়সেই বাংলা ও উর্দু ভাষায় লিখতে-পড়তে শেখেন।[১৭]

মীর সারওয়ার জানের বাড়িতে নিয়মিত ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু কাগজ আসত। বঙ্গবাসী, হিতবাদী মুসলিম হিতৈষী, দৈনিক বসুমতী, প্রবাসী, মুসলমান ও বরিশাল শহর থেকে প্রকাশিত 'কাশীপুর নিবাসী' ইত্যাদি কাগজের তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি মস্ত বড় গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারে আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ অজস্র ছিল। এই গ্রন্থাগার হিন্দু মুসলিম সকল পাঠকের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। বামনা ও তার আশে-পাশের গ্রামের অনেক পাঠক, মৌলবী ও পণ্ডিত এই গ্রন্থাগারে আসতেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গ্রন্থ পাঠ করতেন।[১৮]

মীর সারওয়ার জানের আমলে বামনা গ্রামে দেওবন্দ, জৌনপুর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে মুসলমান মৌলানাদের আগমণ ঘটে। তাঁরা মুসলমানদের ধর্মীয় উপদেশ দেবার জন্য আসেন। মীর সারওয়ার জান তাঁদের খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা করতেন। এইভাবে বামনায় মাঝে মাঝে ইসলাম ধর্ম চর্চার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হত। মীর সারওয়ার জানের খ্যাতি এতটা ছড়িয়ে

১৭ সাক্ষাৎকার
১৮ ঐ

পড়ে যে অনেক দূর অঞ্চল থেকেও বিপন্ন মুসলমানেরা তাঁর নিকটে সাহায্যের জন্য আসতেন। একবার নেপাল থেকে একজন মুসলমান বামনাতে তাঁর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আসেন। নেপালের এই মুসলমানটি গভীর জঙ্গলে হরিণ মনে করে তীর ছুড়ে একটি নীল গাই মেরে ফেলেন। নেপালে নীল গাই মারা নিষিদ্ধ ছিল। তাই সরকার তাঁকে নেপাল থেকে বিতাড়িত করে এবং এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি সে দশ হাজার টাকা জরিমানা দেয় নীলগাই মারার জন্য তাহলে সে নেপালে থাকতে পারবে। তখন তিনি অর্থ সাহায্যের জন্য বাংলায় আসেন। কয়েকজন অর্থবান মুসলমান তাঁকে কিছু অর্থ দেন। বামনাতে এসে মীর সারওয়ার জানের নিকট অর্থ সাহায্য চাইলে তিনি বাকী সব টাকাই দিয়ে দেন।[১৯]

মীর সারওয়ার জানের কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তিনি নিজের বাড়িতে যাত্রা-থিয়েটারের আসর তৈরী করেন। পর্দানশিন মুসলমান মহিলারা যাতে যাত্রা-থিয়েটার দেখতে পারেন তার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেন। বামনার দারোগা উমেশ সেন ছিলেন এই বাড়ির থিয়েটারের প্রধান পাণ্ডা। মীর সারওয়ার জান মনে করতেন, ভালো গান-বাজনা ও আমোদ-আহ্লাদ করা ইসলাম ধর্ম বিরোধী কাজ নয়। সেইজন্য তাঁর বাড়িতে বিবাহের উৎসবে গান-বাজনার ব্যবস্থা করতেন। তিনি স্ত্রীকে সিঁদুর পরতে বলতেন। তাঁকে বলতেন, 'পর, তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগবে।' তাঁর বাড়িতে বিবাহ উৎসবে কড়ি খেলা, কাদামাটি খেলা, রং খেলা, সানাই বাজনা ইত্যাদি হত। মৌলবীরা আপত্তি করলেও তিনি তা শুনতেন না। তিনি বলতেন, 'এই সব করা ধর্ম-বিরোধী কাজ নয়।' ইসলাম শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল বলে মৌলবীরা তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না।[২০]

এমনি এক পরিবেশে মোতাহেরার বাল্যকাল কাটে। মাতামহ বাড়িতে তাঁর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। মোতাহেরার মাতা-পিতাও তাঁর শিক্ষার প্রতি যত্নবান ছিলেন। শৈশবেই পিতার রচনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

১৯ ঐ। মোতাহেরা নেপাল থেকে আগত এই মুসলমানকে দেখেন। তিনি উর্দু ভাষায় মীর সারওয়ার জানের সঙ্গে কথা বলেন। (দ্র ঐ)

২০ ঐ

প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতাই তাঁর কল্পনার দুয়ারের অর্গল খুলে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মোতাহেরা খুব ভালোভাবে বাংলা পড়তে পারতেন, আর অল্প অল্প ইংরেজিও আয়ত্ত করেন। উর্দুও লিখতে-পড়তে শেখেন। মোতাহেরা অল্প বয়স থেকেই পিতা সাজ্জাদের সঙ্গে উর্দুতে কথা-বার্তা বলতেন ও পত্রালাপ করতেন। মোতাহেরা বামনাতে মুনসী ফরজান্দ আলির নিকট ফারসী ভাষা এবং আরবীতে কোরাণ পড়া শেখেন। তিনি তাঁকে উর্দুও শেখান। অবশ্য উর্দুর ও বাংলার প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা নিজে। সংস্কৃত ভাষার ওপর মোতাহেরার দখল হয় তাঁর পিতার জন্য। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আস্বাদন লাভ করেন। আর রামায়ণের ও মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন। এইভাবে একই সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দুয়ার মোতাহেরার নিকট অল্প বয়সেই উন্মুক্ত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের নির্মল হাওয়া তাঁর কিশোরী মনকে আন্দোলিত করে।[২১]

মাতামহের বাড়িতেই মোতাহেরা নিয়মিত বাংলা কাগজ পড়তে আরম্ভ

করেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই সময়ে ধোপার হিসেবের খাতায় মোতাহেরা প্রথমে শব্দ মেলাতে শুরু করেন। তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। পোষা পাখির ছানা মরে গেলো, কেউ বাড়িতে এলো, এই সব ছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। অনেকটা খেলার ছলেই তিনি কবিতা লিখতেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও কয়েকজন ভাই বোনের আগমন হয়েছে। যেহেতু তিনি ছিলেন ভাই বোনদের মধ্যে বড় সেইজন্য তাঁকে তাদের দেখাশুনা করতে হত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতা লিখতেন। এইভাবে মোতাহেরার কাব্য চর্চার সূত্রপাত।[২২]

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল (বাংলা সন ১লা বৈশাখ, ১৩২৬) মোতাহেরার সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হকের আপন ভাগনে আবু নাসার মহম্মদ ইউসুফ আলির বিবাহ হয়। বরিশাল শহরে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের সময়ে মোতাহেরার বয়স সাড়ে তেরো বছর ছিল।[২৩] এই বিবাহের পরেই মোতাহেরার বাবা-মা বামনা গ্রাম থেকে চলে এসে বরিশাল শহরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। বিবাহের পর মোতাহেরা বরিশাল শহরে ফজলুল হকের বাড়িতেই এসে ওঠেন। ইউসুফ আলি ফজলুল হকের বাড়িতেই লালিত-পালিত হন। ফজলুল হকের মা তখন জীবিত ছিলেন। তিনি মোতাহেরাকে খুবই ভালোবাসতেন। আর মোতাহেরাও তাঁর সেবাযত্ন করতেন। ফজলুল হকের মা মারা যাবার সময়ে মোতাহেরা ও ইউসুফ আলি তাঁর কাছে ছিলেন। ফজলুল হক মোতাহেরাকে নিজ পুত্রবধূ-রূপে স্নেহ করতেন।[২৪]

বরিশাল শহরে ফজলুল হকের বাড়ির কাছেই মোতাহেরার বাবা-মা থাকতেন। অনেক সময় দোতলা বাড়ির ছাদে উঠে মোতাহেরা মায়ের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মন তাঁর ওখানেই পড়ে থাকতো। মোতাহেরার বিবাহের পরেই তাঁর পিতা সাজ্জাদ বরিশাল শহরে কংগ্রেস

পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কারাবরণ করেন। এই সময়ে সাজ্জাদ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ খ্রী) সম্পর্কে বাংলাতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়।[২৫] অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় সাজ্জাদ বরিশাল শহরে খুবই পরিচিত হন। অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩ খ্রী) ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা।[২৬] সুতরাং সাজ্জাদ অশ্বিনীকুমার দত্তের নৈকট্য লাভের সুযোগ পান। অবশ্য অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে ফজলুল হক পরিবারের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকালের ছিল। ফজলুল হক পরিবারের প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই পরিবারের গৃহবধূ হয়ে এসে মোতাহেরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্পর্কে মোতাহেরার সেই মনোভাব অটুট ছিল।[২৭]

সাজ্জাদ খুব রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কথায় কথায় নানা উপমা দিতেন এবং ছড়া কাটতেন। তাঁর মুখে যেন ছড়া লেগেই থাকত। কারও অভদ্র আচরনের ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ তিনি ছড়া কেটেই করতেন। অসহযোগ আন্দোলনের দিনে বরিশাল শহরের এক মুসলমান শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। তাঁর সম্পর্কে সাজ্জাদ একটি ছড়া রচনা করে ছাত্রদের তাঁকে খেপানোর জন্য লেলিয়ে দেন। ছাত্ররা ঐ শিক্ষককে দেখলেই মুখে মুখে

সেই ছড়াটি কাটত। সাজ্জাদ রচিত ছড়াটি মোতাহেরার মুখস্ত ছিল। তা হল :[২৮]

ছাগ হেন ঘন ঘন লম্বা দাড়ির নাড়া
তার উপরে চ্যাপ্টা মাথা তারা রারা।

মোতাহেরার বড় মামা ঢাকাতে সাজ্জাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করায় সাজ্জাদ যে ছড়া লেখেন তার কিছু অংশ মোতাহেরার মনে ছিল। তা এখানে উদ্ধৃত করা হল।[২৯]

ঢাকা শহর উর্দ্দু বাজার বালাখানা বাড়ী
ধপ্‌ধপ্‌ করে মতি কটে দেখ নয়নভরি।
ধনীমানী আবি মহম্মদ থাকেন আরাম করে
সেনা আজিজ মেজাজ ভারী গরব করে ফেরে।
খেলাই আছেন বাড়ীর গিন্নী সুরুয়া ঢালেন পাতে
মাষ্টার মুনসী ভয় করিয়া ধরেন তাহার হাতে।
মৌলবী সাহেব কেরাত ছাড়েন দম পেয়াজী সুরে
শেয়াল কুকুর শুনতে তারা চারদিক দিয়ে ঘুরে।

এই অংশটুকুই মোতাহেরার মনে ছিল। এই ছড়াটি হাসির ছড়া ছিল এবং খুবই বড় ছিল। পিতার মত মোতাহেরাও নানা উপমা দিয়ে কথা বলতেন ও ছড়া কাটতেন।[৩০]

প্রকৃতপক্ষে বিবাহের পরেই মোতাহেরার কাব্য চর্চা শুরু হয়। বরিশাল শহরে ফজলুল হকের বাড়িতে পুত্রবধূ হয়ে আসার কিছুদিন পরে মোতাহেরা 'খেলার সাথী' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। স্বামী ইউসুফ আলি মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। তিনি এই কবিতাটি রচনার পরেই 'সওগাত' নামক সচিত্র মাসিক পত্রের সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেবের নিকট নিয়ে যান এবং তাঁকে বলেন, 'যদি প্রকাশ করার মত হয় তবে প্রকাশ করবেন।'[৩১]

তখন 'সওগাত' বিখ্যাত মাসিক পত্র ছিল। বাংলা ১৩২৫ সনে এই কাগজ কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম মহিলা লেখিকাদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার ও জনসমক্ষে পরিচিত করার ব্যাপারে এই মাসিক পত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এই মাসিক পত্রেই প্রথম মুসলিম মহিলা লেখিকাদের ছবি প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে এই কাজ করা কম দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল না। মোতাহেরা রচিত কবিতাটি 'সওগাত' মাসিক পত্রে বাংলা ১৩২৬ সনের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। এই 'খেলার সাথী' কবিতা মোতাহেরার প্রথম প্রকাশিত কবিতা।[৩২]

তারপরে আরও কয়েকটি কবিতা মোতাহেরা রচনা করেন এবং তাঁর সব কয়টি কবিতাই 'মোস্‌লেম-ভারত' নামক সচিত্র মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়: 'বাল-বিধবা' (আষাঢ়, ১৩২৭), 'প্রতীক্ষায়' (শ্রাবণ, ১৩২৭), 'অধীরা' (ভাদ্র, ১৩২৭) ও 'চির-বাঞ্ছিত' (আশ্বিন, ১৩২৭)।[৩৩]

'সওগাত' ও 'মোস্‌লেম-ভারত' মাসিক পত্রে এইসব কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের দৃষ্টি এই নতুন লেখিকার ওপরে পড়ে। 'মোস্‌লেম-ভারত' বাংলা ১৩২৭ সনের বৈশাখ মাসে কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রের প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়: "মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটীকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।" এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মোজাম্মেল হক 'মোস্‌লেম ভারত' সম্পাদনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম মোস্তাফা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, হেমলতা দেবী, কালিদাস রায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মোহিনী সেনগুপ্তা প্রভৃতি লেখক-লেখিকাদের রচনা এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত হত। সুতরাং 'মোস্‌লেম-ভারত' পত্রে মোতাহেরার কবিতা প্রকাশ যথেষ্ট মর্যাদার বিষয় ছিল।[৩৪] এইভাবে ১৯২০

খ্রীষ্টাব্দে খুবই অল্প বয়সে মোতাহেরা কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এই সব কবিতা তিনি চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে রচনা করেন।[৩৫] বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এক মুসলিম কুলবধূর পক্ষে এই কাব্য চর্চা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল।

মোতাহেরার স্বামী ইউসুফ আলি নিজেও কবিতার ভক্ত ছিলেন। তাঁর ডায়েরীর পাতা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভরা ছিল।[৩৬] রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা তাঁর মুখস্ত ছিল। আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে ইউসুফ আলির যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। স্বভাবতই মোতাহেরার কাব্য চর্চায় তিনি খুশি হন এবং তাঁকে উৎসাহিত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, ইউসুফ আলির বড়দিদি সারা তৈফুর সাহেবাও একজন লেখিকা ছিলেন।[৩৭] সুতরাং বিবাহের পরে মোতাহেরা কাব্য চর্চার পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশ পান। এই সময়ে ইউসুফ আলির অন্তরঙ্গ বন্ধু কাজী নজরুল ইসলামও মোতাহেরার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। মোতাহেরার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ফজলুল হক পরিচালিত 'নবযুগ' দৈনিক কাগজ মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তখনও ইউসুফ আলি সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেননি। তিনি বরিশালে থাকলেও প্রায়ই কলকাতাতে ফজলুল হকের সঙ্গে কাটিয়ে যেতেন। এই সময়ে মুজফ্ফর, নজরুল ও ইউসুফ পরস্পরের খুবই অন্তরঙ্গ হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপূজার ছুটিতে ইউসুফ আলির আমন্ত্রণে মুজফ্ফর ও নজরুল বরিশালে বেড়াতে যান। তখন ফজলুল হকও সেখানে ছিলেন। কয়েকটা দিন তাঁদের বেশ আনন্দে

কাটে।[৩৮] সেখানেই মোতাহেরার সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহ্মদের পরিচয় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই নজরুল মোতাহেরাকে 'কবি বোন' বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন: 'মোতাহেরা আমার বোন।' নজরুল কলকাতা ফিরে এসে মোতাহেরাকে চিঠি দেন।[৩৯] হাবিলদারের বেশে নজরুলের যে ছবি তোলা হয় তার একটি ছবি ওপরে এই কয়টি কথা লিখে নজরুল মোতাহেরাকে উপহার দেন:[৪০]

"বাঙ্লার মহিলা-কুল-গৌরব আমার কবি বোন
মোতাহেরাকে দিলুম। ভ্রাতৃত্ব-গৌরবান্বিত নজরুল
ইস্লাম। ২৫শে পৌষ, ১৩২৮।"

মোতাহেরা ও নজরুলের মধ্যে অনেক পত্রালাপ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশভাগের পরে কলকাতাতে বাড়ি পরিবর্তনের সময়ে সেই মূল্যবান পত্রসমূহ হারিয়ে যায়। মোতাহেরার নিকটে লিখিত পত্রে নজরুলের দরদী ও স্নেহ-পরায়ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সব সময়ে তাঁকে 'কবি বোন' বলেই সম্বোধন করতেন।[৪১]

প্রায় একই সময়ে বিখ্যাত সুর ও স্বরলিপি লেখিকা শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তার সঙ্গে পত্রালাপে মোতাহেরার যোগাযোগ হয়। মোহিনী দেবী ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলের ২৬।২ বাহির-মির্জ্জাপুর রোডে থাকতেন। তিনি 'সওগাত' ও 'মোসলেম-ভারত' মাসিক পত্রে মোতাহেরার কবিতাসমূহ পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং মোতাহেরাকে পত্র লিখে অভিনন্দিত করেন। 'খেলার-সাথী' কবিতাটি পড়ে তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে মোতাহেরাকে প্রথম পত্র লেখেন। তখনও তিনি মোতাহেরার ঠিকানা জানতেন না। তাই 'সওগাত' পত্রিকার ঠিকানায় তাঁর নামে পত্র পাঠান। এইভাবে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৪২] মোহিনী দেবী মোতাহেরা রচিত 'অধীরা' কবিতাটিকে গানে এনে স্বরলিপি করার পরেই বিখ্যাত গায়ক কে. মল্লিক এই গান রেকর্ড করেন। বাঙালী মুসলিম মহিলা কবিদের মধ্যে মোতাহেরার রচিত গানই প্রথম রেকর্ড করা হয়।[৪৩] পরে মোহিনী দেবী মোতাহেরার 'প্রতীক্ষায়' নামক কবিতাটিকে গানে এনে

স্বরলিপি করেন। এই দুটোর স্বরলিপিই মোহিনী দেবী রচিত 'স্বর-মূর্চ্ছনা' পুস্তকে স্থান পায়।[৪৪]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মোহিনী দেবী-মোতাহেরা পত্র বিনিময়ের কয়েকমাস পরে মোতাহেরা স্বামী ইউসুফ আলির সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে আসেন। তাঁরা দুজনে রিপন স্ট্রীটে ফজলুল হকের বাড়িতে ওঠেন। মোতাহেরা মোহিনী দেবীকে দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইউসুফ আলির নিকট হতে এই খবর পেয়ে নজরুল তাঁকে বলেন: 'তুই কাকে খুঁজছিস্। মোহিনী সেনগুপ্তা তো আমাদের গান স্বরলিপি করেন।' নজরুল ইউসুফ আলিকে সঙ্গে করে মোহিনী দেবীর বাড়িতে যান এবং তাঁকে হক সাহেবের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এইভাবে মোতাহেরার সঙ্গে মোহিনীদেবীর সাক্ষাৎকার ঘটে। ফজলুল হকের দ্বিতীয় স্ত্রী মোহিনী দেবীকে খুব আদর যত্ন করেন। মোহিনীদেবী মোতাহেরাকে দেখে বলেন: 'আমি ভেবেছিলাম আমার বয়সী কেউ। এই তো দেখছি আমার মেয়ের বয়সী।' মোহিনীদেবী মোতাহেরাকে খুব আদর করেন এবং তাঁকে কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেন।[৪৫]

কিন্তু ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সন্তানাদির আগমনে এবং সাংসারিক দায়-দায়িত্বের ফলে মোতাহেরার কবিতা রচনায় ভাটা পড়ে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী স্বামী ইউসুফ আলি বরিশাল সদর অফিসে সাব-রেজিস্ট্রার রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। এই কাজে তাঁকে বামনা গ্রামেও থাকতে হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তিনি বরিশাল জেলার নলছিটি গ্রামে সাব রেজিস্ট্রার হয়ে যান এবং সেখানে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত থাকেন। তিনি নলছিটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও দীর্ঘকাল ছিলেন। মোতাহেরা

স্বামীর সঙ্গে এই নলছিটি গ্রামে কাটান। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নয় সন্তানের জননী হন। তার মধ্যে দুই পুত্রের ও এক কন্যার অকালে মৃত্যু হয়।[৪৬] এই অবস্থায় তিনি যেসব কবিতা রচনা করেন তার সংখ্যা বেশী নয়। অবশ্য কাজের ফাঁকে পড়াশুনার অভ্যেস তিনি কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি সুদূর নলছিটি গ্রামে কলকাতায় প্রকাশিত প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, সওগাত, মোহাম্মদী ইত্যাদি মাসিকপত্রসমূহ সংগ্রহ করে নিয়মিত পড়তেন।[৪৭]

অবশেষে ইউসুফ আলি নলছিটি থেকে কলকাতায় বদলি হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে মোতাহেরা কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। প্রথমে ২৮নং আমির আলি এভিনিউতে ইউসুফ আলি থাকতেন। তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাড়ি বদল করে ১৭এ দিলখুসা স্ট্রীটে এসে ওঠেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম নিয়মিত ইউসুফ আলির বাড়িতে আসতেন। এই সময়ে মোতাহেরা নজরুলের সামনে এসে কথা বলতেন। নজরুলও অবাধে অন্দর মহলে চলে যেতেন। দুজনের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। তাই মোতাহেরা ভাইকে খুবই যত্ন করতেন এবং প্রায়ই নজরুলকে নানা রকম জিনিষ রান্না করে খাওয়াতেন। মোতাহেরার রান্না নজরুল খুব পছন্দ করতেন। এই বাড়িতে মাঝে মাঝে নজরুল দরাজ গলায় গান গাইতেন এবং মোতাহেরার পুত্র-কন্যাদের আদর করে মাতিয়ে তুলতেন। তাঁর ছোট দু একজন পুত্র-কন্যা নজরুলকে ঘোড়া বানিয়ে তাঁর পিঠে চড়েও বসত। মোতাহেরার তৃতীয় কন্যা বুলুকে তিনি 'বেদুইন-মেয়ে' বলে ডাকতেন।[৪৮] এই সময়ে নজরুল ফজলুল হক পরিচালিত 'নবযুগ' কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ কর্তৃক 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হবার পরে ফজলুল হক 'নবযুগ' কাগজের মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ত্বের ও মুসলিম

লীগের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। নজরুলের শক্তিশালী কলম তাঁর এই কাজের সহায়ক হয়। 'নবযুগ' কাগজে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নজরুলের বলিষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই মুসলিম লীগ মহল নজরুলের ওপর বিরূপ ছিলেন। আর ইউসুফ আলিও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। ইউসুফ আলির বাড়িতে নজরুলের যাতায়াত দেখে তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী খুশি হননি। তাঁরা নজরুলের চরিত্র সম্পর্কে নানারকম কটাক্ষ করে মোতাহেরাকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু মোতাহেরা এইসব অযাচিত উপদেশ অগ্রাহ্য করেন।[৪৯]

এই অবস্থায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হঠাৎ নজরুলের ইউসুফ আলির বাড়িতে আসা বন্ধ হয়ে যায়। জুলাই মাসের গোড়ায় একদিন জুলফিকার হায়দর নজরুলের একটা চিঠি নিয়ে এসে ইউসুফ আলির বাড়িতে উপস্থিত হন। কিন্তু নজরুলের হাতের লেখা ভালো করে পড়া যায়নি। তাতে লেখা ছিল: 'ইউসুফ আমার অবস্থা খারাপ। তুই চলে আয়। আমি কথা বলতে পারিনা'[৫০] এই চিঠি পাওয়া মাত্র ইউসুফ আলি ফজলুল হকের নিকটে যান এবং তাঁর নিকট হতে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করেন। হক সাহেব ইউসুফকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। ইউসুফ আলি শ্যামাপ্রসাদের নিকটে যান। তখনই শ্যামাপ্রসাদ নিজে পাঁচশত টাকা দেন। ইউসুফ আলি এই টাকা নিয়ে নজরুলকে দেখতে যান এবং তাঁকে দিয়ে আসেন। তাছাড়া ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদের নিকট চিঠি লিখে তাঁকে নজরুলের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। ইউসুফ আলি সেই চিঠি শ্যামাপ্রসাদকে দেন। এই চিঠি

পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ নজরুলকে আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেন। এইসব তথ্য উল্লেখ করে মোতাহেরা মন্তব্য করেন: 'জুলফিকার হায়দর যে সব কথা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন তা সত্য নয়। তিনি অযথা হক সাহেবের ও ইউসুফ আলির কুৎসা করেছেন'।[৫১] নজরুলের বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাবার পরে ইউসুফ আলির পরিবারে এক বিষণ্ণতা বিরাজ করে। নজরুলের প্রতি এই পরিবারের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কখনই ম্লান হয়নি। একটি কবিতায় মোতাহেরা তা ব্যক্ত করেন।[৫২] ইউসুফ আলিও নযরুলের জন্য কতটা অনুভব করতেন তা তাঁর ডায়েরীর পাতা থেকেই জানা যায়।[৫৩]

কলকাতায় আসার পরে সাংসারিক ঝামেলার চাপে মোতাহেরা নিয়মিত কাব্য চর্চা করতে না পারলেও মাঝে মাঝে কবিতায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁর কয়েকটি কবিতা 'সওগাত' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি অনেক বাংলা কবিতা, গল্প ও উপন্যাস পড়েন এবং প্রখর স্মৃতি-শক্তির অধিকারী হওয়ায় অসংখ্য কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বঙ্কিম, রমেশ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকের রচনাসমূহ তিনি খুব যত্ন

সহকারে পাঠ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন : নরেন্দ্র দেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, অন্নদাশঙ্কর রায়, মুজতবা আলি, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নজরুল, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর জীবনানন্দ ও সুভাষ প্রভৃতি কবির অনেক কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কথায় কথায় বিভিন্ন কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে এখানে উল্লিখিত প্রতিটি লেখকেরই গ্রন্থ ছিল।[৫৪] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রতি বছর মহালয়ার উষাকালে আকাশবাণী কর্তৃক যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হত সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ মোতাহের তা শুনতে ভালোবাসতেন এবং সমগ্র প্রোগ্রামটাই তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যায়।[৫৫]

যেহেতু মোতাহের মূল ফারসী ভাষায় ফের্দৌসী, ওমর খৈয়াম, সাদী ; হাফেজ ও জালালউদ্দীন রুমী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের রচনা পাঠ করেন, সেইজন্য তাঁদের কোন রচনা বাংলায় তর্জমা হলে তার প্রতি তিনি সহজেই আকৃষ্ট হতেন। কান্তিচন্দ্র ঘোষ যখন বাংলা ছন্দে ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ-গুলি (রোবাইয়াৎ অর্থাৎ চতুষ্পদী) তর্জমা করে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন তখন বাংলার কাব্য জগতে এক আলোড়ন ঘটে। পরে এই রোবাইয়াৎগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত এবং প্রথম চৌধুরীর ভূমিকাসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৫৬] মোতাহের এই গ্রন্থগুলি বরিশাল শহরে থাকা-

কালীন সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থখানি পেয়ে তিনি খুবই খুশি হন। কিন্তু ফারসী ভাষায় রচিত মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করার পরে মোতাহেরার মনে হয় কান্তিচন্দ্র ঘোষ রোবাইয়াৎগুলির ঠিক ঠিক অনুবাদ করেননি, তার ভাব নিয়ে কবিতা লিখেছেন।[৫৭] এই সময়ে কান্তিচন্দ্র ঘোষের তর্জমা সম্পর্কে 'সওগাত' মাসিক পত্রে তরিকুল আলমের ও 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে জলধর সেনের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাও মোতাহেরা পড়েন।[৫৮] তার অনেক পরে নরেন্দ্র দেবের ওমর খৈয়ামের তর্জমা প্রকাশিত হয়। এই তর্জমাই মোতাহেরার বিশেষ প্রিয় ছিল। নরেন্দ্র দেবের তর্জমাই তাঁর নিকট পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গত মনে হয়েছে। তাঁর হাতের কাছে সব সময়ে নরেন্দ্র দেবের এই গ্রন্থখানি থাকত এবং এই গ্রন্থের অনেক কবিতাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।[৫৯] ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'পারস্য-প্রতিভা' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হলে মোতাহেরা তা সংগ্রহ করেন। যদিও এই গ্রন্থে অনুদিত কবিতার সংখ্যা কম তবুও পারস্য কবিদের বিষয়ে যে বিস্তৃত তথ্য ছিল তাতে মোতাহেরা খুশি হন।[৬০]

এই সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মোতাহেরা মিশর, আরব দেশের প্রাচীন কাহিনী, ইসলাম, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন। তিনি পুত্র-কন্যাদের নিকট সেইসব কাহিনী খুবই সহজ ভাষায়

বলতেন।[৬১] এইভাবে সাহিত্য চর্চার ও বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণের প্রয়াস থেকে মোতাহেরা কখনই বিচ্যুত হননি। তাঁর সংবেদনশীল ও কল্পনাপ্রবন মন সম্পূর্ণভাবে বিষয় সম্পত্তির ও রাজনৈতিক প্রবাহের আওতার বাইরে ছিল। এমনি করে তাঁর জীবনের সময় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গড়িয়ে এলো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের সর্বনাশারূপ তাঁর মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। অনেককাল আগে গ্রাম বাংলায় হিন্দু-মুসলিম জীবনের যে সহজ ও স্বাভাবিক চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেন তা একের পর এক তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর স্বামী ইউসুফ আলি ও ভাসুর ওয়াজির আলি দেশভাগের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত করেন। তাই মোতাহেরাও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও বাংলা বিভাগের পরে কলকাতাতেই থাকেন। তাঁর স্বামী ও ভাসুর উভয়েই এখানে উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৬২]

প্রধানত ঘরের কোণেই মোতাহেরার সময় অতিবাহিত হত। কদাচিৎ কোন সভায় তিনি যোগদান করতেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই কলকাতা থেকে মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম' প্রকাশিত হয়। মোতাহেরার সঙ্গে এই কাগজের সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন 'বেগম'-এর নূতন কার্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে মহিলাদের এক প্রীতি সম্মেলন বেগম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপিকা কল্যাণী সেন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক এবং বেগমের লেখিকা ও পাঠিকাগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 'বেগম'-এর সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম এই পত্রিকার উন্নতির জন্য সকলের সাহায্য কামনা করেন। আশাপূর্ণা দেবী শুভকামনা করে চিঠি দেন। এই অনুষ্ঠানে ইন্দিরা দেবী, মোতাহেরা বানু, মিসেস এ. কে. ফজলুল হক, প্রতিভা গাঙ্গুলী, বাণী চৌধুরী ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।[৬৩] মোতাহেরা 'বেগম' পত্রিকার

শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। আর 'বেগম' কাগজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি 'বেগম'এর শুভকামনা করে কবিতাও রচনা করেন। এই কাগজেই তাঁর পরিণত বয়সের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর 'বেগম' ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা থেকেও তাঁর কলকাতার ঠিকানায় 'বেগম' নিয়মিত পাঠানো হত।

১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় মোতাহেরার শরীর ভেঙে পড়ে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি ডাঃ নারায়ণ রায়ের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর চিকিৎসায় তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ডাঃ নারায়ণ রায় তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তারপরে মোতাহেরা এগারো-বারো বছর ডাঃ নারায়ণ রায়ের নির্দেশমত চলেন।[৬৪] ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী স্বামীর মৃত্যুর পরে মোতাহেরা পূর্বপাকিস্তানে ঢাকায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকটে চলে যান এবং বাকী দিন গুলো সেখানেই কাটান। তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে যায়। এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি আবার কিছু কিছু কাব্য চর্চা করে সময় কাটান। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মোতাহেরা ঢাকায় থাকাকালীন যে সব কবিতা রচনা করেন তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। এই সময়ে 'বেগম'-এর প্রতিটি ঈদ সংখ্যায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তিনি টুকরা টুকরা কাগজে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কবিতা রচনা করেন। তিনি সেইসব কবিতার শিরোনামা সব সময়ে দেননি, আবার কিছু কিছু কবিতা অসমাপ্ত থাকে। অনেক কবিতায় রচনার সময়কালও নেই। এইসব টুকরা কাগজে রচিত কবিতাগুলো দেখলেই এবং তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য থেকে মনে হবে, মোতাহেরা যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলছেন এই কবিতার মাধ্যমে।[৬৫]

তিনি আর হৃদরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই রোগ প্রকট হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হন। মার্চ মাসে তাঁকে ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।[৬৬]

এখানে উল্লিখিত তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মোতাহেরা দীর্ঘকাল নিয়মিত কবিতা রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি। তাঁর কাব্য চর্চার সময়কাল হল জীবনের প্রথম দিকে বিয়ের পরে দু-তিন বছর এবং জীবনের শেষ প্রান্তে পাঁচ-ছয় বছর। এর মাঝে তাঁর কাব্যচর্চা খুবই বিক্ষিপ্ত ভাবে হয়েছে। প্রকৃতি ও পার্থিব জীবন তাঁর মনকে যেভাবে প্রভাবিত করে তারই অনুরণন তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। এখানে ঈশ্বর অনুপস্থিত বল্লেই চলে। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবতী নামাজী মহিলা, তবুও তাঁর অনুভূতি প্রবণ মনের প্রসার এই রূপে-রসে-গন্ধে ভরা প্রকৃতি ও পৃথিবী কেন্দ্র করেই। এই মর্ত্তে 'ছোট্ট কুটিরে' সাধারণ গৃহস্থের মত তিনি যে সুখনীড় বেঁধেছিলেন, শেষ জীবনে তারই স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে বেদনা ও নিঃসঙ্গতা তাঁর মনকে উতলা করে তোলে। ফেলে আসা দিন গুলো বারে বারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই কুটিরের সুখনীড়ই তাঁর নিকট একমাত্র কামনার বিষয় ছিল, আধুনিক সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমক তাঁর নরম ও স্নিগ্ধ মনকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে। বিলাস বহুল হোটেলে বিবাহিতা নারীকে তাই তিনি উর্বশীর বেশে দেখতে চাননি। অন্যদিকে বিজ্ঞানের অফুরন্ত অগ্রগতিকে তিনি স্বাগত জানান। চাঁদের বুকে মানুষের অবতরণ তাঁর মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নাহলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (মার্চ-ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিফলন ঘটে।[৬৭]

যদিও মোতাহেরা মূলত কবি, তবুও তাঁর গদ্য রচনাও লক্ষণীয়। তিনি পুত্র কন্যাদের নিকটে যে সব পত্র লেখেন এবং মাঝে-মাঝে আত্মগতভাবে নিজের সম্পর্কে যে সব মন্তব্য লিখে রাখেন তা থেকেই তাঁর গদ্য রচনার রীতিটি পরিস্ফুট হয়। তাতে তাঁর কল্পনা ও শব্দ চয়ন যুক্ত হয়ে এক নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। [৬৮]

অনেককাল আগে 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী' মাসিকপত্র বাঙালী মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকদের পরিচিত করার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করলেও, পরবর্তীকালে আর তাঁদের সকলের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া দুর্লভ। বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে কোন কোন মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও তাকে কোনমতেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও মূল্যায়ন বলা যায় না। তাই অনেকের নামই আজ স্মরণে আসে না। এমনি একটি হারিয়ে যাওয়া নাম হল কবি মোতাহেরা বানু। অথচ তিনি বাঙালী মুসলিম মহিলা কবিদের মধ্যে প্রথম সারির একজন লেখিকা ছিলেন। গৃহকোণে আবদ্ধ থাকলেও তাঁর নিরলস সাহিত্য চর্চার যে পরিধি ছিল তা বিস্ময়কর। বহু ভাষাবিদ এই মহিলা কবি আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন। কদাচিৎ তাঁর উল্লেখ প্রবন্ধে বা গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাংলা ১৩৪১ সনের চৈত্র মাসে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রে একটি প্রবন্ধে মোতাহেরার নাম উল্লেখ করা হয়।[৬৯] আরও অনেক পরে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট 'বেগম' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হয়: "আর একটি প্রতিভা পর্য্যাপ্ত সৃষ্টির অভাবে প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেলো অথচ তাঁর স্বল্প সংখ্যক কবিতাসমূহ সমৃদ্ধ ভাবধারা ও প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয়। ইনি সৈয়দা মোতাহেরা বানু। ভাবের সম্ভারে, ভাষার সৌষ্ঠবে এবং ছন্দের মাধুর্য্যে মোতাহেরা বানুর কবিতাগুলি অনবদ্য।"[৭০]

প্রখ্যাত মুসলিম মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল মোতাহেরার সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁকে 'আপা' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি মোতাহেরার কবিতার সুখ্যাতি করতেন। মোতাহেরা ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। দেশভাগের পরেও বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। বেগম সুফিয়া কামাল ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকা থেকে কলকাতাতে মোতাহেরার স্বামীকে একটি পত্রে লেখেন: "মনে পড়ছে

মোতাহেরা আপাকে।...আপার কাছে বহু আগে একটী চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁর কতক কবিতা আমার দরকার ছিল। শুধু তাঁর নাম নিয়ে নিয়ে কত বলব। কিছু কবিতা হাতের কাছে থাকলে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। দেবেন আপার কয়েকটি কবিতা?" ৭১

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর গ্রন্থে মোতাহেরা বানুর কাব্য চর্চা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আর কোন গ্রন্থেই মোতাহেরার বিষয়ে এইভাবে কেউ আলোচনা করেননি। প্রকৃতপক্ষে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদই প্রথম মোতাহেরার নাম অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের পরে সাংবাদিক জনাব রাহাত খান মোতাহেরা বানুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ 'দৈনিক ইত্তেফাক' কাগজে প্রকাশ করে তাঁর কাব্য চর্চা জনসমক্ষে তুলে ধরেন।[৭৩] মোতাহেরার পরলোক গমনের পরে ঢাকার প্রতিটি কাগজেই তাঁর বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক বাংলা' ও 'দৈনিক ইত্তেফাক' মোতাহেরার স্মরণে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে এই 'প্রবীনতমা মুসলিম মহিলা কবি'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।[৭৪]

—অমলেন্দু দে



সৈয়দা মোতাহেরা বানু

খেলার সাথী

আমি যখন শুয়ে ছিলাম
স্বপন-মাখা ঘুমে,
কে সে আমায় জাগিয়ে ছিল
নয়ন চুমে চুমে।
সে যেন মোর খেলার সাথী
ছিল সে কোন দেশে,
তাই সে আমার কাছে আসে
মৃদু মধুর হেসে।
লাজুক চোখের চাউনি খানি
এঁকে দেখায় মনে,
অম্‌নি আমি জেগে উঠি
আবেগ ভরা প্রাণে।
আমি তারে দেখতে গেলে
সে যায় সরে লাজে,
স্মৃতি তাহার সদাই যে মোর
মরম-বীণায় বাজে।
শান্ত-স্মিত আনন খানি,
উজল চোখের তারা,
ডাকে আমায় গানের সুরে
করে পাগল পারা।
চাঁপার কলি আঙুলগুলি
তারি পরশ লেগে,

কাফেলা

অতীত সে মধুর স্মৃতি
অম্‌নি উঠে জেগে।
কোন্ কালে কোন্ সুদূর দেশে
কোন্ সে ফুলের বনে,
ছিলাম দোঁহে আপন মনে
চাঁদের আলোর সনে।
ও গো আমার খেলার সাথী,
শুন তোমায় বলি,
পরের দেশে ফেলে আমায়
আর যেওনা চলি'।
অমন করে দূরে স'রে
আর দিওনা ব্যথা,
আপন দেশী বন্ধু তুমি
রাখো আমার কথা।
যাবার বেলা আপন দেশে
আমায় যেও নিয়ে,
খেলব আবার তেম্‌নি করে
তোমার সনে গিয়ে।

বাল-বিধবা

আজিকে কাহার আকুল নয়ন
জাগিছে হৃদয়ে মম।
যেন রে কাহার ব্যথিত বয়ান
বাজে বুকে শেল সম।
জীবনের সার রতন তাহার
কে যেন নিয়েছে হ'রে।
অধরে তাহার হাসিটুকু নাই,
সদা আঁখে জল ঝরে।
কি মলিন বেশ কি চাঁচর কেশ,
দেখিয়া বিদরে বুক।
হেরিলে আহা সে বিষাদ-মূরতি
হৃদয়ে বাজে রে দুখ।
অবলা সে বালা না গাঁথিতে মালা
শুকাল কুসুম তা'র।
না খেলিতে খেলা ফুরাইল বেলা,
হুতাশ হইল সার।
পশিতে বিপিনে ফুল তুলিবারে
কাটিল নিঠুর নাগে।
দুনিয়ার লীলা ফুরাল দু-দিনে
শুধুই যাতনা জাগে।

মুকুলে শুকাল হৃদয়-প্রসূন
শুকাল নধর লতা,

কাফেলা

সরলা কোমলা বিরহ-বিভলা,
সার শুধু নীরবতা।
সাধের যামিনী পোহাল তাহার
না কহিতে দুটী কথা
ডুবিল চাঁদিমা অমার সাগরে,
জাগিয়া রহিল ব্যথা।

প্রতীক্ষায়

আমি রেখেছি রিক্ত
হৃদয়-আসন
তব আগমন-আশে হে সখা।
আজি প্রেম-ফুলদলে
অর্ঘ্য র'চেছি
পূজিতে তোমারি চরণ-রাকা।
ওহে বঁধু, আজি
বড় আশা করি'
ধুয়েছি মরম আঁখির জলে।
ভকতি-কুসুমে
সাজায়েছি তায়
ও মোহন ছবি আঁকিব ব'লে।
তুমি যদি প্রিয়,
না আস আজিকে
মম এ পিরীতি-কুঞ্জমাঝে,
মম হরষ-কানন
পূরিবে বিষাদে
পিয়াসা জাগিবে সকাল-সাঁঝে! ৩

অধীরা

তুমি ·কর গো আমায় বধির তোমার
অধীর বাঁশরী বাজায়ে,
এস হৃদি-কদম্বে শিহরণ তুলি
হিয়ার যমুনা নাচায়ে !
ধেনুগণ গোঠে নাহি আসে আর
বাজে না তো বেণু এখানে,
বহে না উজান, বাঁশের বাঁশীর
বাজে নাক তান সে-কানে।
পুণঃ আকুল কর গো ব্যাকুল কর গো
বাজাও বাঁশের বাঁশরী,
আর কোন দিকে যেন যাইতে না পারি
তারি মায়া-তান পাশরি।
বঁধু লজ্জা শরম ভরম ধরম
কিছু নাহি চাই চাই হে,
শুধু তোমাতে মজিতে·তোমারি হইতে
তোমাতে ছুটিতে ধাই হে !
ভালো- বাসিতে জানি না, হৃদয় আমার
উষর কঠিন দারুময়,
তুমি সুঁদর নাগর প্রীতির সাগর –
তোমার·হিয়া তো মরু নয় !
মম উষর হৃদি এ সুসার কর গো
ঢালিয়া প্রণয়-অমিয়া,

মোতাহেরা বানু

আমি   পাশরিয়া সব থাকি যেন শুধু
তোমারি চরণে নমিয়া।
আকুলতা-ঢেউ জাগাও বক্ষ—
পরশে, যেন সে হিমাচল;
তোমাতে নিশেষে মিশে যাক বঁধু
আমার আমির এ সীমা-তল।
রাজা হে!
যত   ভূষণ আমার হ'রে নিয়ে দাও
তোমার বসনে সাজায়ে,—
ওগো,   কর গো আমায় বধির তোমার
অধীর বাঁশরী বাজায়ে! ৪

চির-বাঞ্ছিত

চির বাঞ্ছিত তুমি হে রাজা আমার
জীবনে আমার মরণে !
আমি তোমা তরে বঁধু ব'সে আছি, কর
লাঞ্ছিত হৃদি চরণে।
তোমারি বেহাগ তোমারি সোহিনী
নিশীথে উষায় শুনি প্রিয় শুনি,
ছন্দে গন্ধে বরণে ;
তোমা পানে বঁধু শুধু চেয়ে আছি,
এস এস চির-শরণে,
মম জীবনে হে মম মরণে !
কত তান লয় উঠে মিশে যায়
বাজে বুকে রাজে স্মরণে,
এস এস প্রিয়, দিয়ো দেখা দিয়ো
হেসো অন্তঃকরণে !
মম জীবনে গো মম মরণে !
তব আশে কালা গাঁথিয়াছি মালা
অশ্রু-প্রসূনে নয়নে,—
নিয়ো মালা নিয়ো, জ্বালাইয়ো প্রিয়
নয়নের আলো শয়নে !
বজর-বেদন ভুলাইয়া দিয়ো
চুম্বন আঁকি' স্মরণে,—
মম জীবনে হে মম মরণে !

মোত'হেরা বাম্নু

কালিমা হৃদের ঘুচাও দয়িত,
হিরণ তোমার কিরণে ;
ভুলে থাকি যদি—জাগায়ো আঘাতে
নয়নের ঘুম হরণে।
বেদন দিয়ো গো, নিয়ো গো প্রিয় গো,
শরণ দিয়ো গো চরণে,
হে রাজা আমার, চির-বাঞ্ছিত
জীবনে আমার মরণে! ৫

স্মরণে

সে আমারে ডেকে ডেকে,
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে,
মরমে বেদনা এঁকে—
ফিরিয়া গেল।

ব্যথাভরা সে চাহনি,
কয়ে কি অফুট বাণী,
সুর-বাঁধা বীন্ খানি—
ব্যথিয়া দিল।

সেদিন ঐ তরুতলে,
বসিয়ে জ্যোছনা জালে
সিক্ত নয়ন তলে
ডাকিল কাছে।

আমি আসি আসি বলে,
যাতনা দিয়েছি হেলে,
বুঝিনি সে মঞ্জু ফুলে—
কি সুধা আছে।

দেখেছি বনের পথে,
সজল আঁখির পাতে,
ফিরে চায় যেতে যেতে—
বিদায় ক্ষণে।

আজো এ মলিন সাঁজে,
সে বাণী গভীরে বাজে,
ছবিটী হৃদয়ে রাজে—
এ ফুল-বনে।

বাদল-প্রাতে

(১)

এ বাদল বরিষণে কে আমায় যাচিল !
আকুল হিয়ার বনে,
দেয়া ঢাকা উষাখনে,
কাহার কাজল আঁখি ঝর ঝর ঝরিল !

(২)

কোন্ উদাসীর শ্বাস এ বাতাসে মিশেছে !
প্রিয় বুঝি কাছে নাই,
শূন্য সকল ঠাঁই,
বিরহিনী বঁধু তাই মেঘলায় কেঁদেছে !

(৩)

আকাশের কালো বুকে বিদ্যুৎ চকিল !
হৃদয় শিহরণ জাগে,
প্রিয় পরশন মাগে,
সলাজ সজল আঁখি কি করুণ হাসিল !

(৪)

ওগো, তুমি কেঁদনাক এ বাদল ধারাতে !
কান্ত ফিরিয়া এল,
অশ্রু মুছিয়া ফেল,
তোমারি রাগিনী হের বাজে তার বীণাতে

শাওন-নিশীথে

শাওন রাতে আঁখির পাতে
নিদালি ঘনিয়ে আসে,
কে তুমি গো অচিন পিয়া
এলে মোর দ্বারের পাশে !
মুরছি' পথিক-হাওয়া
অলকের সুবাস আনে ;
নূপুরে শিঞ্জন তাই—
বাদলের পাগল গানে !
নিশীথের নীরব ব্যথায়
চপলার চমক লাগে ;
জাগায়ে নিঝুম ঘুমে
পিয়া সে বিদায় মাগে !
মেঘে যে মাদল বাজে—
এ যে গো বাসর-রাতি ;
চেয়ো না অচিন সখা,
জ্বালিয়া আশার বাতি !
আজি এ বাদল-ধারায়
বাজে কার বিদায় ব্যথা ;
জাগে মোর মরম-পাতে
অচেনা বঁধুর কথা ।
শাওনের সজল স্বপন
বুকে মোর কাঁপন জাগায় ;

মোতাহেরা বান্নু

নিশীথের পাগল ঝোরা
চোখে মোর অশ্রু ঝরায়।
আঁধারে পলক-হারা
অনিমেষ নয়ন মেলে ;
বুঝি বা চির সাথী
বঁধুয়া আজ্‌কে এলে !
যাত্রা মোর খেয়া-পারে,
এসো গো পরাণ-প্রিয় ,
উতলা বাদল-হাওয়ায়
হৃদয়ের পরশ দিয়ো !

অবেলায়

আনখেয়ালী বনের পাখীর
　　　　শিসের বাঁশী হাওয়ায় কাঁপে,
কে বুলালে রঙের তুলি
　　　　অবেলারি আকাশ বেপে !
সোনার মেঘের তরী বেয়ে
　　　　কে যায় পাড়ি নীল গগনে !
একলা চালায় সাঁঝের খেয়া
　　　　চপল মেয়ে ভয় না মানে।
কোন রূপসীর আঁচল উড়ে
　　　　শূন্য মাঠের অন্ত ছেয়ে,
খেয়ালীরে দিক ভুলাল
　　　　কোন্ তরণীর অচিন নেয়ে !
চোখ গেল আজ ডেকে ডেকে
　　　　চোখের জ্বালা জানায় লোকে,
কোন্ বিরহীর অবোল ব্যথা
　　　　মুখর হল পাখীর ডাকে।
দিনের শেষে সাঁঝের স্বপন
　　　　কি কথা কয় কানে কানে,
পথচারীর মন ভুলেছে
　　　　স্বপন পারের পথ না জানে।

ঘুমপাড়ানী

কচি পাতা চোখ মুদেছে,
পাখীর ছানার গান থেমেছে,
অাঁধার এলো ঘিরে।
ঘুমো আমার সোনার-খোকন
বনের কোলে ডাকছে স্থতম,
চাসনে ফিরে ফিরে।
চাঁদের দেশের আসবে পরী
আলোর মুকুট মাথায় ধরি' ;
ভয় পাছে পাস জেগে
তাইতো বলি লক্ষ্মীমণি
থামাও তোমার চুল্‌বুলানি,
ঘুমিয়ে পড় আগে।
তল তলে ওই বাঁশের চারা
ঘুমের চুমায় হল সারা,
খোকন-মণি ঘুমো।
ধুনার আবেশ আয়রে চোখে,
ঘুমা মাণিক মায়ের বুকে
একটি দিয়ে চুমো।
মুক্তা ঘুমায় ঝিনুক পটে,
তেমনি করে বক্ষে লুটে
মায়ের বুকে ঘুমো।
পালক বুলায় ঘুম পাড়ানী,
ঘুমো সুখে ছুল ছুলানী, –
চুমোর পরে চুমো। ১০

'বৌ কথা কও'

'বৌ কথা কও বৌ কথা কও' গান
আর কত কাল গাইবি বনের পাখী।
ব্যথায় ব্যথায় আকাশ হ'ল নীল,
বাতাস কেঁদে দোলায় তরুর শাখী।
বৌ তবু তোর কয়না কিরে কথা,
ভাঙল নাকি নিঠুর প্রিয়ার মান!
কল্পলোকের কোন্ খেয়ালী তোর
অবহেলায় কাঁদায় আকুল প্রাণ!

মৌনমুখে শাশ্বত এ গান
কে শিখালে—কোন গুণী সে বল;
মেঘে মেঘে খুঁজে না পাস তারে,
তাই সুরে তোর ঘনায় মেঘ-জল;
অকরুণী কইবে না আর কথা,
শুনবে না তোর মধুর মর্ম্মধ্বনি
বৌ কথা কও, বৌ গো কথা কও,—
বিশ্বে এ গান রইবে চিরন্তনী। ১১

শিশু-সপ্তক

যবে উষা জাগে উদয়-তোরণে
আবির ছড়ায়ে মেঘ-অঙ্গনে ;
আঙিনায় মোর খুশি ছড়াইয়া উহারা জাগে,
ঘুম-জাগা চোখে কচি হাত পাতি প্রসাদ মাগে,
হেরি কি অনুরাগে !
ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা ঘনায়,
ঢুলিছে কমল মন্থর বায়,
ঘুমায় আমার শিশু-সপ্তক জাগে তারা,
আকাশ-বাসরে জেগে রয় চাঁদ তন্দ্রাহারা,
রচে স্বপন-কারা।
ওরাই আমার হারাণো কবিতা,
যা'ছিল বেদনা ভুলেছি সবি তা' ;
ও'দের হাসিতে গানে গানে আর নৃত্যতালে—
সাধের স্বপন পূর্ণ প্রভায় জ্বলে এ-ভালে ! ১২

শিশু-সপ্তক

সপ্ত তারার একটি হার,
নয়নে এনেছে মায়াবিথার।
ওরা কারা মোরে সপ্তকণ্ঠে মা' ব'লে ডাকে ;
মনের গগনে সাত রং দিয়ে ধনুক আঁকে,
ঘন মেঘের ফাঁকে !
ওরা উচ্ছল সাগরের জল,
ওরা অশান্ত চিরচঞ্চল,
এ উহার গায়ে আছাড়িয়া পড়ে ঢেউয়ের পারা ;
কভু কান্নায় ফুলে ওঠে, কভু হাসিয়া সারা,
ওরা পাগল পারা।
চিত্ত-কারার আগল ভাঙিয়া
ওরা দিল সাত-নদী বহাইয়া,
সেই নদী-স্রোতে সাত শিশু অবগাহন করে ;
সাত শতদল হাসিয়া ফুটিল পুলকভরে
একই মৃণাল পরে।
ফেরদৌসের পুষ্প-কাননে
সাত চাঁপা ফুটেছিল আনমনে,
মোর সাধনায় চুমিল সে ফুল ধরার ধূলি ;
সপ্ত ফুলেরে ধূলি ঝেড়ে বুকে লইনু তুলি,
শত কামনা ভুলি।
মোর পরাণের সপ্ততন্ত্রী
সাত যাদুকর-পরশে মন্দ্রি'
উঠিল মধুর গীতি-ঝঙ্কারে পরাণ মোহি,
অঙ্গনে মোর সাত সোনা মুখ দেখিনু চাহি—
তার তুলনা নাহি। ১৩

প্রত্যাবর্ত্তন

পরিম্লান গোধূলি বেলায়
একে একে তারকার হাসি ফুটে ওঠে
ছায়াঘন আকাশের গায়।
অন্ধকার নেমে আসে তাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে,
উড়ে যায় বিহগেরা শূন্যপথে আপনার নীড়ে।
শ্রান্ত দেহে পথচারী গৃহপানে ফিরে।
দিবস রাত্রির এই ম্লান সন্ধিক্ষণে
কি লয়ে চলিনু ফিরে আপন ভবনে।
মনে ভাসে সন্তানের হতাশা মলিন দৃষ্টিখানি,
কানে আসে পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী ;
তারি মুখ ভেসে ওঠে মনো-বাতায়নে।
হতবাক্ মোর পানে চাহে সন্ধ্যাতারা,
ক্লান্তপদে গৃহপানে চলি দিশেহারা।
মানিক ফেলিয়া গ্রন্থি বাঁধি বস্ত্রাঞ্চলে,
হারাই পথের দিশা অন্ধ আঁখিজলে। ১৪

হেমন্তিকা

সে কোন ছন্দে রচিব আমার
মধুর হেমন্তিকা !
আজ সুদূরের প্রবাসীর কাছে
হয়নি পত্র লিখা ।
কণ্ঠে আজ নাহি আসে সুর,
বাতাসে কাঁদিয়া ফেরে হেমন্ত বিধুর ।
শরতের শেষ দান ঝ'রে যায়
শুভ্র শেফালিকা ;
সাঁঝের দিগন্ত চোখে ঘনায়েছে
স্বপ্ন-কুহেলিকা ।
তারপরে রাত্রি আসে যবে
পূর্ণ করি পানপাত্র হিমানী-আসবে,
অরণ্য ঘুমায়ে পড়ে টানি তার
হিম-যবনিকা ।
চাঁদ শুধু জাগে একা জ্বালিয়া
সহস্র দীপালিকা ।
চোখে আজ তন্দ্রা নাহি আসে,
আমি জাগি, জাগে প্রিয় দূর পরবাসে
আর জাগে আলোছায়া পথে
নীহারিকা ।
মৌন নিশীথের নভে বিথারিয়া
মায়া মরীচিকা । ১৫

হেমন্ত রজনী

সে কোন ছন্দে রচিব আমার
মধুর হেমন্তিকা,
আজ সুদূরের প্রবাসীর কাছে
হয়নি পত্র লিখা।
কণ্ঠে আজিকে নাহি আসে সুর
কাঁদে হেমন্ত ব্যথায় বিধুর ;
শরতের শেষ দান ঝ'রে যায়
শুভ্র সে শেফালিকা।

মান রাত্রির দিগন্ত পারে
স্বপ্নের কুহেলিকা,
দূর অরণ্য ঘুমায় টানিয়া
হিমানীর যবনিকা।
মোর চোখে আজ নিদ্ নাহি আসে,
আমি হেথা জাগি, প্রিয় পরবাসে,
উপর আকাশে নীহারিকা রচে
মায়াময় মরীচিকা। ১৬

কি লেখা যায় !

উঃ কি গরম। কি রোদ !
কি লেখা যায় বলতো !
রাস্তার পিচ-গলানো রোদ,
দিকবলয় প্রাসাদ শির্ষে
ঢাকা পড়েছে।
ওরে একটু সবুজ নেই হেথায় ;
নিয়ে চল যেখানে সবুজ বন,
সেখানে নিয়ে যাও আমাকে।
মন উড়ো পাখি, সে বাধা
মানতে চায়না।
কি লেখা যায় বলতো ?
এই দিনে এই কাঠফাটা রোদে,
এই রাস্তার পিচ-গলানো রোদে
ঝাপসা দৃষ্টি ফিরে আসে
দিক-বলয়ের প্রান্ত হ'তে।
আজকের দিনে
কি লেখা যায় বলতো ?
লেখা যায় অবাধ্য মনের
ইচ্ছার রূপগুলি। ১৭

ওগো বিদ্রোহী, ওগো হোথা !

শৃঙ্খল টুটে দেশ জননীর,
অযুত কণ্ঠে গান আজাদির
পুণ্য-লগনে গগনে পবনে ভাসে ;
ওগো বিদ্রোহী, ওগো হোতা,
আজ তুমি কোথা—
ওগো তুমি কোথা !

হে চারণ-কবি, জেগে ওঠো আজ,
ধূলি হতে তুলি লহ তব তাজ,
মুক্ত আলোকে গাহ জীবনের গান।
(আজ) তোমারে স্মরণে এসেছে সবার ;
ভাঙা বীণা তুলে লহ আর বার,
গানে গানে দাও ভরিয়া লক্ষ প্রাণ।
এ অজ্ঞাতবাস কেন হে সব্যসাচী,
নবারুণ রাগে হাসিয়া উঠিছে প্রাচী—
জেগে ওঠো কবি, সাড়া দাও—সাড়া দাও,
আসা'ব কাহাফি ঘুম ভেঙে ফিরে চাও ;
দ্বার হতে সবে ডেকে ফিরে যায়,
আজো কি তোমার হয়নি সময় ?
তুমি চেয়েছিলে যাহা, গেয়েছিলে যেই গাথা—
এসেছে সেদিন, শুধু তোমারে দেখিনা সেথা।
ওগো বিদ্রোহী, ওগো হোতা,
আজ তুমি কোথা, ওগো তুমি কোথা ![১৮]

সোনার খাঁচায়

সোনার খাঁচায় ময়না পাখি
দাঁড়ে বসে খাও ছোলা,
বনের স্বপন যাও ভুলে ভাই,
মনের স্বপন থাক তোলা।
কমলা রঙের মিষ্টি রোদে
পাখনা মেলে নাচ লাগা,
খেয়াল খুসির আনন্দেতে
মনের বীণায় সুর জাগা,
খোকাখুকুর সোহাগ নিয়ে
কান্নাহাসির জাল বোনা।
রোজ নামচার ঝুলি ভরুক
বাস্তব এবং কল্পনা।
দিনের বেলায় সূর্য হাসে,
রাতের বেলায় চাঁদ তারা
সবার চোখে ঘুমের পরশ
তোমার নয়ন ঘুম-হারা। ১৯

কাল বৈশাখী

কালবৈশাখী দুর্মদ রোষে ধমকায়,
নীল অরণ্য কম্পিত বুকে থমকায় ;
ঘরে ব'সে ব'সে ভয় পাই,
আঁকড়িয়া ধরি চার পাই ;
ঝড়ে ক্ষ্যাপা মোষ গাঁক গাঁক করে গরজায়।
দড়াম দড়াম ঘা'মারে জানলা দরজায়।
সার্সির কাচ ধোঁয়াটে,
বাইরে দৃষ্টি ঘোলাটে ;
উন্মাদ ঘোড়া বিজলি-চাবুকে চমকায়।
লম্ফে ঝম্পে লাগাম ছিঁড়ছে দমকায়।
আসমানে কালোমেঘ—
উদ্দাম বায়ু বেগ,
ডালপাতা ছিঁড়ে মূল ধ'রে গাছ ওপড়ায়।
নৃত্যের তালে তেরছা বৃষ্টি ছলকায়।
তুফানে ফুঁসছে পাইথন ;
আড়মোড়া ভেঙে চল মন ;
বেঁধে নাগপাশে ঘর-বাড়ী করে চুরমার ;—
মাতাল বাতাস ভাঙার নেশায় দুর্বার।
জীর্ণ যা' কিছু ভাঙবে,
নতুন ফসল আনবে ;
সে আনন্দে কি তোলপাড় করে সৃষ্টি!
বাজ কড়কায়, নামে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি।

রং নেই

রং নেই রজনী গন্ধায়
তবু তার শুভ্রফুল বাসে
রজনীরে ধন্য করে আপন গৌরবে।
সে সুবাস মদির বাতাসে
রাতজাগা চোখে ঘুম নামে
স্বপ্ন ভরে মৌন অনুভবে।
যে দুয়ারে তালা ঝুলছিল
খুলে গেল কার করাঘাতে।
বিহঙ্গমন ছাড়া পেলে আজরাতে :
তোমার নৌকাতে সাদা পাল,
জানিনা কোথায় জমবে রাতের পাড়ি!
রজনীগন্ধা, হাত রাখো মোর হাতে।
আমার তরণী ঢেউয়ে ঢেউয়ে টলমল ;
শঙ্কায় কাঁপে অশান্ত ভীরুমন ;
আকাশ মুখর ঝটিকার সঙ্কেতে।
জীবন সীমার ওপারের আলোছায়া
ডাক দিয়ে যায় বেদনার সঙ্গীতে ;
নিয়ে চলো মোরে সেই আলোছায়া পথে। ২১

শামিমা বানুর শুভ-বিবাহে
দোওয়াই খয়ের

কল্যাণী মোর কুমারী কন্যা,
দোওয়াই খয়ের লও ;
নব জীবনের প্রস্তুতি নিয়ে
হাসিমুখে কথা কও।
অজানারে তোর ভয় কেন এত
ওরে ভীরু পাখি মোর।

অন্য ভবনে শুভ উৎসবে
ডাক পড়েছে যে তোর।
সেথায় জ্বলেছে হাজার দীপালি
নব স্নেহ প্রীতি ঢালা ;
এসেছে নতুন রাজার কুমার
হস্তে বরণ মালা।

জীবনের পরমোৎসব রাতে
তাহারে বরিয়া লও।
সব সুখে দুখে একান্ত মনে
তার ডাকে সাড়া দাও।
ভাই বোনে মিলে সাজায় তোমারে
শুভ-বিবাহের সাজে।

সোনা ভাবী মনি ছুটোছুটি করে
তোমার বিয়ের কাজে ;
জীবন তোমার সুন্দর হোক্
সার্থক হোক্ সাধ।
চিরায়ুষ্মতী হও তুমি মাগো
করি শুভাশীর্ব্বাদ। ২২

শুধাই তোমারে

(১)

শুধাই তোমারে, নিরুদ্দেশের
যাত্রা হলকি শুভ জীবনের
ইঙ্গিত বহ ! বল মোরে খুলে বল ;
তোমা লাগি আমি শঙ্কায় টলমল ।
ভয়াল রাত্রি, নয়ন নিদ্রাহারা ;
সাথে জেগে রয়
তিমির রাতের তারা ।
কোথায় রয়েছ সুখ নীড়ে
কিংবা দুঃখ-সায়র-তীরে ?
নাই—নাই – কোন সংবাদ নাই,
দুর্ভাবনার জটায় ক্লান্ত তাই ।

(২)

নিরুদ্দেশের যাত্রা পথের শেষে
কি পেলে তোমার আকিঞ্চনের
ফল । সে কি সুখনীড় কিংবা
জতুগৃহ ; বল মাগো মোরে সব
আজি খুলে বল ।
শুনে খুশি হই অথবা
দুঃখে ভাসাই বুক তোমার ,
খবর যা হয় আমারে দাও ।

(৩)

নিরুদ্দেশের যাত্রাপথের শেষে
কি মিলিল বল জীবনের সম্বল ?

জীবন শুকায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে।
বল মাগো সব খুলে আজ বল,
যা আছ মাগো
সে কি সুখনীড় কিংবা জতুগৃহ ?
যেথা আছ মাগো আছে কি গো
ভালোবাসা ? প্রেম প্রত্যয় নবজীবনের
আশা ? শুধাই তোমারে। ২৩

দুই তরঙ্গ

জীবনের ক্লান্ত সন্ধিক্ষণে
করেছিনু ছুটির প্রার্থনা মনে মনে।
হয়নি সফল সেই ব্যাকুল বাসনা ;
শৃঙ্খলিত পদযুগ অশেষ বঞ্চনা
সয়ে সয়ে কেটে যায় একে একে দিন।
নয়নের আলো নেভে, প্রাণ দীপ্তিহীন।
সব আলো নিভে গেলে, তুমি দেবে আলো
সেই আশা পথ চাহি দিন যে ফুরালো।
যা ছিল দেবার মত সকলি দিয়েছি,
বিনিময়ে যা চেয়েছি তাও কি পেয়েছি ?
দুঃখ করা মিছে জানি জীবন-খেলায়—
হারজিত সমন্বয়ে সাগর-বেলায়
কারো বা মুকুতা জোটে কারো বা উপল।
ডুবুরির ভাগ্য-খেলা পলকে নিষ্ফল।
হতে পারে, তাই নিয়ে হতাশার জালে,
কি লাভ এ অন্ধকারে হৃদয় জড়ালে।
হৃদয়ে বিছায়ে দাও তোমার আলোক,
ভুলাও তোমার প্রেমে সর্বতাপ শোক ;
আমারে বাঁচাও তব করুণা ধারায় ;
বাঁচুক আমার শান্তি তব স্নেহচ্ছায়।
তব সান্ত্বনার শুভ অঙ্গুলি-সংকেতে
আমারে দেখাও পথ অন্ধ তমসাতে ;
আনন্দ বেদনা মোর যা' কিছু সঞ্চয়
সব সমর্পণ করি দিলাম তোমায়।
তুমি মোরে যাহা দিবে দুঃখ কিবা সুখ
হাত পেতে তাই লব, ফিরাবনা মুখ। ২৪

চ'লে এসো

হোটেল ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল :
নবম বেহেস্ত এনেছে হেথায়।
নাচ আছে আর গান আছে আর
আছে আনন্দ-বন্যা।
চলে এস সব জোড়ায় জোড়ায় ;
হুর গেলেমান মত্ত সভায়
নতুন শাড়ীর আঁচল উড়ায়
রূপসী যত অনন্যা।
তুমিও নাচবে আমিও নাচব ;
খুশি খোসহালে জীবনে বাঁচব,
নিত্য নতুন ধরণে সাজব
ধরণীরে করি ধন্যা।
সেলুনেতে গিয়ে নানা ডিজাইনে
খোপা বেঁধে এস নব রূপনয়নে
নৃত্যের তালে। ২৫

আধুনিক

হোটেল ইন্টার কন্টিনেণ্টালে
কফি খেতে চলো রাতে।
দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে
হুরপুরী জলসাতে।
তুমিও নাচবে, আমিও নাচব,
জুটি বেছে মনোমত।
আনন্দ ঢল নামবে সেথায়,
নতুন শাড়ীর আঁচল উড়ায়ে
আসবে রূপসী যত ;
যারে মন চায় বেছে নিতে পার
কারো তাতে মানা নাই।
চুড়ো খোঁপা আর বব ছাঁটা চুলে
সেলুনের চেকনাই—।
শারাবের ঢলে করব আমরা
আনন্দে অবগাহন।
রূপ ও রূপিয়া ওড়াব ছড়াব
যত চায় যার মন।
লজ্জা শরম কুসংস্কার যত
ও সব সেকেলে ধরন।
লাথি মেরে সব
দেব যে উড়ায়ে
যত নৈতিক বচন। ২৬

এ যুগের তোমরা উর্বশী

(১)

হোটেল ইণ্টার কন্টিনেণ্টালে
চাম্বেলি রুমের ফ্লোরে বেজে চলে
তোমাদের জোড়া হাইহিল।
সংক্ষিপ্ত-বসনা সাবলীল—
মাতা নও, কন্যা নও, নও বধূ,
তবু সুন্দরী রূপসী—
অনন্ত যৌবনা গরীয়সী,
এ যুগের তোমরা উর্বশী।

(২)

হোটেল ইণ্টার কন্টিনেণ্টালে
চাম্বেলির ফ্লোরে বেজে চলে
নৃত্যপরা তোমাদের জোড়া হাইহিল।
সংক্ষিপ্ত বসনে সাবলীল—
স্নেহ-বঞ্চিত ট্রেণ্ড আয়াদের সাথে
তোমাদের শিশু কেঁদে কেঁদে জাগে রাতে,
তোমাদের তাতে কতটুকু আসে যায়।
তোমরা ভাসছ ফুর্তির আকাশের নীলিমায়।

(৩)

মাতা নও, কন্যা নও, নও বধূ,
লাস্যময়ী সুন্দরী রূপসী—

কাফেলা

অনন্ত-যৌবনা গরীয়সী,
এ যুগের তোমরা উর্বশী।
অভিজাত হোটেলের ফ্লোরে
ঠকাস ঠকাস শব্দে বেজে চলে
তোমাদের জোড়া হাইহিল—
সংক্ষিপ্ত-বসনে সাবলীল।
তোমাদের শিশু কাঁদে যে আঁধার রাতে
ট্রেণ্ড আয়াদের স্নেহ বঞ্চিত বুকে।

(৪)

মাতা নও, কন্যা নও
বধূ নও, সুন্দরী রূপসী
সুযৌবনা নৃত্য পটিয়সী
একালের তোমরা উর্বশী।
চাম্বেলীর কার্পেট মোড়া ফ্লোরে
হাইহিল সব বাজে ড্রিক দিম ক'রে।
নকল ভুরুর ধনুকের টঙ্কারে
নৃত্যসঙ্গি যেই হোক
তাতে দোষ নেই।
কালকের কথা কাল হবে
আফসোস নেই।
চাম্বেলীর অঙ্গন তলে
ঠকাস ঠকাস শব্দ তুলে
বেজে চলে তোমাদের যত হাইহিল ;—
ভাঙে গড়ে বহুতর দিল। ২৭

জালের ঘরে

আবদ্ধ জালের ঘরে আমি
যেন একটা বন্দি শিস্পাখি।
ধানমণ্ডির লেক যেন এক গড়খাই।
ভয় দেখাবার ষড়যন্ত্র চেতনার
গ্লানি আর বিষন্নতার পিরামিড
জমে ওঠে। দিন যায়, রাত আসে ;
লিখিতে যা চাই একটাও কিছু হয় না।
তোমাদের তুলি ছবি আঁকে,
রেখায় চিত্রে ধ'রে রাখে
এই পৃথিবীর রং রূপ আর ছন্দ।
আমার তুলিতে রং নেই,
আঁকবার মত মন নেই,
করে থাকি তাই চোখ দুটোরে মোর বন্ধ।
মন পবনের নৌকো চ'ড়ে
বাবুমুনি আসে।
কত স্বপন হাসে মনে
কত স্বপন ভাসে। ১৮

রান্না খেয়ে

রান্না খেয়ে কান্না পায়।
তেঁতুল নেবু নিয়ে আয়।
মুরগী নাকি আরশোলা।
ওয়াক-থুথু—ব্যাঙ কোলা—
দায় হলো যে ভাত গেলা।
গন্ধে পালায় ভূত বালা।
এবার আনো ঘোড়ার ডিম,—
ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা হিম;
মুখে যদি স্বাদ যোগায়
ছ'পন কড়ি দিও তায়।
আমায় দিয়ে সব গেলাও,
ফজলি আমের টক খেলাও। ২৯

পুষি-সমাচার

এই, শোন ওরে পুষি
ক্যাট।
ধ'রে খাবি শুধু
ফ্যাট র‍্যাট
ছাতে ব'সে মিউ মিউ
করবি না মোটে।
পুঁটি মাছ যদিই বা
জোটে,
খেয়ে নিবি তাই
চেটে পুটে।
বাবুদের খাবার
টেবিলে
চোখ তুমি দেবে নাকো
ভুলে।
তাহলে চামচ কাঁটা
ধরতে হবে।
পুষি নাম ছেড়ে তবে
সাহেব হবে।
নিতে হ'বে সাহেবি
ট্রেনিং
শিখে নিবি মিহিসুরে
গুড্ মর্নিং।
নাচতে হবে চা-চা
টুইস।

কাফেলা

সবারে জানাবি
গুড উইস।
খাবি খাসা
চাইনিজ ডিস।
চপ কাটলেট
ফ্রাই ফিস।
খাবা তুলে
হ্যাণ্ডসেক করবি;
এর অন্যথা হলে
মরবি।
নিয়ে যাও খাঁটি
পরামর্শ—
বিলিতি ভাবের
উৎকর্ষ
চট পট করে নাও
রপ্ত;
তা না হলে হবে
অনুতপ্ত।
বেরাল জনম কর
ধন্য
ভুলে যাও ভাব ভাষা
বন্য।
ইংলিশ এটিকেট
ভর্সা
না শিখিলে
পরকাল ফর্সা। ৩০

মার্জার-সংবাদ

এই শোন্ স্যায়ামিজ
ক্যাট।
ধ'রে খাবি শুধু ফ্যাট
র‍্যাট।
ছাদে বসে ম্যাও ম্যাও
করবিনা মোটে।
পুঁটি মাছ যদিই বা জোটে
খেয়ে নিবি তাই
চেটে পুটে।
বাবুদের খাবার
টেবিলে।
চোখ তুমি দেবে নাক
ভুলে।
তা'হলে চামচ কাটা
ধরতে হবে ;
পুষি নাম ছেড়ে তবে
সাহেব হবে।
নিতে হবে সাহেবি
ট্রেনিং
ইংলিসে বলতে হবে—
গুড মর্নিং।

কাফেলা

নাচতে হবে চাচা
আর টুইস :
সবারে জানাতে হবে
গুড উইশ্ ।
ইংলিস এটিকেট
ভর্সা
না হলে পরকাল
ফর্সা । ৩১

ঠাণ্ডা লড়াই

ঠাণ্ডা লড়াই, এক ভীষণ ঠাণ্ডা লড়াই
চলছে আমার চেতনারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।
যাত্রা শেষের শেষ সম্বলটুকু,
তারো পরে কেন লোভের অন্ত নেই ?
লঘুচাপ আর নিম্নচাপের খেলায়
হারাবে বিশ্বমায়েরে ভেবেছ বুঝি ;
সে আশা সফল হবে না তো কোনোদিন।
মা'র খে'য়ে খে'য়ে হাসবে বসুন্ধরা ;
তোমার আঘাতে ভেঙে যাবে হাতিয়ার
ভাঙবেনা তবু ধরণী ধৈর্যশীলা। ৩২

স্নায়ু-যুদ্ধ

স্নায়ু যুদ্ধ এক কঠিন স্নায়ু যুদ্ধ !
অলক্ষ্য তীরে বিক্ষত দেহমন :
এই নিয়ে
চ'লছে আমার চেতনারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
উদ্যত তীর।
স্নায়ু যুদ্ধ, এক কঠিন স্নায়ু যুদ্ধ !
চ'লছে আমার চেতনারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ;
যাত্রা শেষের শেষ সম্বলটুকু
তারোপরে যেন লোভের অন্ত নেই
আমার আকাশে অনেক তারার মেলা :
অন্ধরাতের হৃদয়ে জ্বালায় বাতি
সেথায় তোমারো আসন ছিল যে পাতা।
সে কথা আজকে স্মরণে কেননা আসে!
কিন্তু আমার সুকঠিন নির্মোকে
লেগে ভাঙবেই যতো সেরা হাতিয়ার।
এই স্নায়ুযুদ্ধের অশরীরি হাতিয়ার
প্রতিহত হবে বুকে লেগে বার বার।
তবু মুক রবে জননী বসুন্ধরা
অলক্ষ্যে শুধু বহাবে নয়ন ধারা। ৩৩

আমি আজ নির্ভয়

থাক পড়ে তোর
উচ্ছে করেলা পলতা।
আমি চল্লুম দৌড়ে,
পেরিয়ে রাস্তা।
খানা ডোবা সব
পেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে।
পৌঁছে গেলাম
মা' ভাই বোনের পাশে।
হায়রে জালিম
তোর মুখে চুনকালি ;
ভাঙা কাঁচে আর
লাগে না তো জোড়াতালি।
পালিয়ে বেঁচেছি
জিন্দানখানা হতে।
ও ফাঁদে পা আর
পড়বে না কোন মতে।
ভুল বুঝি নাই
স্বরূপেই দিলে দেখা ;
বুঝিলাম সবি
ভাগ্য লিপি লেখা।
হোক নাই হোক
মোর জীবনের জয়।
মোহমুক্তির মুক্তি আঁকা,
আমি আজ নির্ভয়।[৩৪]

শিকারীর জাল

ক্রুড় ঈগলের চঞ্চু নখরে
বিক্ষত বুকে লোহু ঝরে পড়ে।
প্রাণ দিয়ে
পিছনে ফেলিয়া অনাদর অবহেলা—
শ্যেন পক্ষির চঞ্চু নখর জ্বালা
পেরিয়ে এলাম স্নেহনীড়ে পথ খুঁজি
জীবন যুদ্ধে বিক্ষত বুক আজি।
তবু নেকড়ের চোখে দিয়েছি তো ধুলি,
পালাতে পেরেছি শিকারীর জাল কেটে
তবু জ্বান নিয়ে কণ্টক। ৩৫

আঁধার উঠুক্ ভ'রে

মাতা কন্যার দিন কাটে একা ঘরে
চাঁদের জ্যোৎস্না আসে সেথা জাল ছেঁকে।
আর চোখে পড়ে তারাদের ভগ্নাংশ।
জালের ওপারে শ্রাবণের ধারা ঝরে।
মেয়ে ডেকে বলে,—"আম্মাগো ভোর হ'ল
হাত ধ'রে তুমি চলে এসো মোর সাথে।"
"কোথা যাব,"—মাতা সুধায় মেয়েকে ডেকে।
মেয়ে বলে, "যেথা আঁধারে ফুটেছে আলো।"
"ও আলোকে মোর নেই অধিকার মাগো ;
চেতনা আমার আঁধারে উঠুক ভ'রে
কামনা বাসনা মিলাক অন্ধকারে।
তুমি সোনা রাঙা ভোরের আলোকে জাগো ;
তোমা তরে মোর টিয়া পাখী মন খাঁচায় বেঁধেছে বাসা,
দানাপানি খেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।
পরিত্রাণের পথ খোঁজা ভুলেছে সে
তোমারে ঘেরিয়া প্রাণ পায় মৃত আশা।" ৩৬

দুঃখ

দুঃখ, তুমি বন্ধু মোর চির জীবনের।
সবাই চলিয়া যাবে সুখ-লগনের,
তুমি শুধু থেকে যাবে হে সঙ্গি আমার
আমার চেতনা ঘিরে তিমির,
কোনো কিছুতেই ভয় নেই ;
ভয় পাবার কি আছে !
সুখ দুঃখের হিসাবের খাতা
পড়ে থাক আজ, পরে মিলাব তা ;
কিছু ভাংচুর কিছু জোড়াতালি
এই নিয়ে চলে খোঁড়া দিনগুলি।
কোথা আশা—কোথা নিরাশা—
কোথা আলো—কোথা কুয়াসা !
এই স্নায়ুযুদ্ধের কবে হবে শেষ
বলে দাও মোরে বলে দাও ?
সম্মুখে জাগে সবুজ ছড়ানো প্রান্তর।
এই স্নায়ুযুদ্ধের শেষ হবে কবে
বিঁধবে আমাকে অলক্ষ্য হাতিয়ারে ?
তাই চোখে আজ ঘুম নেই রাতে
দিনের শান্তি তাও গেছে ধুঁয়ে মুছে ৩৭

চিন্তার জট

জলসা ঘরের পাশে
ভুঁড়ো শেয়ালী কাশে ;
অনিদ্রাতে ভোগে
রাত কেটে যায় জেগে।
মগজের কোষে কোষে
চিন্তার জট জাল
সঙ্গিন উঁচিয়ে
আসে চোখ টকটকে
লাল ।
পলায়নে পার নাই ;
এক বিষম সংকট
আসে মুখপোড়া মর্কট।
হুপ হুপ দাপাদাপি।
জলসা ঘরের
পাশে থাকে
ভুঁড়ো শেয়ালী
ইনসমনিয়া রোগে
ভুগে হয় খেয়ালি।
মগজের কোষে কোষে
জট বাঁধে চিন্তা ;
সঙ্গিন উঁচিয়ে

কাফেলা

নাচে ধেই ধেই
ধিনতা।
পলায়নে পার নাই,-
এ বিষম·সঙ্কট
দাঁত ছিরকুটে নাচে
মুখপোড়া মর্কট।
রাতের আঁধার
নামে, গাছপালা
মাটিতে
শেয়ালীর কাঁথা
ভেজে শিশিরের
পানিতে। ৩৮

হলদি বনে

ডাক ছাইড়্যা কই
মাগো মা—
মনের কথা
হুইন্যা যা।
হলদি বনে
থাকুম না ;
হলদি খাইয়া
বাঁচুম না।
কাঞ্চা হলুদ
মাইখ্যা গায়
হইলদা পক্ষি
ডাইক্যা যায়।
আমার হইল
বিষম দায়।
সউর্ষা ফুলে
চোখ জ্বালায়,
হলুদ বরণ
হুম্মাই খান
দেইখ্যা কান্দে
জান পরান।

শুইন্যা লোকে
কয় ছি ছি,—
পাগলী বুড়ী
এ কয় কি।
বলে, হলদির গুণের
তুল্য নাই,
কইল্যা গেছেন
শ্যাজার ভাই।
হলদি গোলা
পানিতে
নাইয়া লও
আসানিতে,
বাতের ব্যারাম
থাকব না,—
সর্দ্দি কাশি
লাগব না। ৩৯

পথের শেষে

সমাপ্তির পথের প্রান্তরে কিনারে
কাঁটার গাছ অঙ্কুর বিস্তারে।
সমাপ্তির সীমারেখা ধরে
চলেছি অনেক পথ নিশ্ছিদ্র
আঁধারে। তল নেই তার ;
রিক্ততার সীমাহীন নিষ্ঠুর
আঘাতে বিক্ষত হৃদয় ;
মন শুধু পথ খোঁজে, কোথা
শান্তি।
সারাদিন একঘেয়ে রোদের
আকাশে চিল ওড়ে ডানা মেলে ;
দুপুরে জ্যৈষ্ঠের খরা আগুন
ঝরায়। জানালার জাল ঘেরা
ঘরে বসে
সমাপ্তির পথ রেখা
ধরে এসেছি অনেক দিন ;
পরে চেনা অচেনার
দেশে রিক্ত নির্মোকে
ঢেকে দেই।
কেহ দিল ভালোবাসা,
কেউবা দিলনা,
সে নিয়ে কাঁদেনা আজ

মনের ভাবনা।
কে দিল সুধার পাত্র,
কে দিল ছলনা,
সে চিন্তায় কাজ নেই ;
বিকৃত ভাবনা আপনারে
লয়ে দিনে রাতে
ব্যস্ত থাকে প্রাণ।

নিয়ম

সুন্দর লাল গোলাপ ফুলগুলো
ছাগলে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো।
রূপ বর্ণ গন্ধের কোনোই মূল্য
বোধ নেই ছাগলের ;
স্রেফ পেটের তাগিদেই সে
খেয়ে চলে। তোমরা কিন্তু
ক্ষমা করলে না তাকে।
সেই অপরাধে তাকে লাঠি
পেটা করে করলে নাজেহাল।
অন্যদিকে
ভেবে দেখ তোমার টেবিলে
গোটা একটা মোরগ মোসাল্লাম
শোভা পাচ্ছে ; . স্বাদে গন্ধে
বিগলিত হয়ে কাঁটা চামচে
টুং টাং আওয়াজ তুলে
তার গোস্ত গুলো রেলিস
করে খাচ্ছ তুমি। তখন
তো কৈ, বেচারি মুরগীর
অতীত সৌন্দর্য্যের কথা
মনে করে আফসোস
করলে না তুমি।

এতে দোষ কাউকেই দেওয়া
চলে না ;   কারন এটাই
নিয়ম,—একেই বলে মাৎস্য—
ন্যায়।   এই নিয়মের চাকায়ই
ছনিয়াটা ঘুরছে। ৪১

রাত নেমে আসে

কখন যে জীবনের জানালা কপাট
চূর্ণ হ'ল আকস্মিক ঝড়ের আঘাতে ;
কতক ভগ্নাংশ তার ছড়াল আকাশে
দিনান্তের আলোছায়া।
আজ শুধু এক মুঠি ছাই হয়ে গেছি ;
একদিন ফুল ছিল, ফল ছিল
পাখী ছিল, গান ছিল, নদী ভরা জল ছিল,
আজ কিছু নাই।
আজ শুধু হয়ে গেছি এক মুঠি ছাই।
বালির চড়ায় তবু কোনো প্রাণী থাকে
ভস্মস্তূপে প্রাণের পরশ নাই।
জেগে জেগে রাত নিঃশেষে মুছে যায়।
সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় প্রভাত জাগে ;
চোখে মুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার আরাম
আজকের দিনে কি বলব কি বলা যায় বলতে।
সন্ধ্যার পরে রাত নেমে আসে
বাদুড়ের ডানায় চড়ে। ৪২

ভরে রাখো সোনার কৌটায়

যেদিন ফুরাল আশা ও বাসার খেলা
সেই দিন হতে শুরু হল পথ চলা :
সেই চলার আর বিশ্রাম নেই।
নিয়ে চল মাগো, হাত ধরে নিয়ে চল।
চোখে নেই আলো, বুকে নেই আর বল।
ঘরের কোনেতে মা ও মেয়েতে থাকি ;
রাতের তিমিরে তারায় তারায় জাগি
যেখানে রাতের নিবিড় অন্ধকারে
তারার আলোর বাতি মিট্ মিট্ করে।
কোথায় যেন যেতে ইচ্ছা হয়।
অবুঝ মন বাধা মানতে নারাজ।
রোদের মেজাজ চটে আগুন :
অতীতের সুর বাহার ভেঙে খান খান।
মগজের জলসায় কারা যেন
বল নাচ নাচে ; কারা—ওরা কারা ?
চিনি চিনি মনে হয় তবুও চিনিনা।
রোদ-পোড়া সন্ধ্যা রোরুদ্যমান।
রোদ বিনা চিল পাখা গোটালো,
এখন তোমার শেষ ছড়ানো মনের
টুকরোগুলো কুড়িয়ে নাও, ভরে রাখ
যে কোনো সোনার কৌটায়। ৪৩

ইতিবৃত্ত

মধুখালি আর বিষখালি
মিলে অনেক স্মৃতির কীট
বাসা বেঁধেছে এই পুরাতন
কঙ্কালে। তারে মুছে ফেলি
এমন সাধ্য নেই ; মনে করতেও
মোটেই লাগেনা ভালো।
ডাকছে আমাকে তাম্বুলখানা -
হাট। সিরোমনি সার—বিরাট
শুকনো দীঘি। রাজার বাড়ীর
হাজার সিঁড়ির ধাপে, ডালিমের
বীজ অবলুপ্তির পথে।
মধুখালি এক মরা বন্দর
বিষখালি এক পাগলা নদীর
নাম। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে
শত কেউটের ফণা পাড়ি ভেঙে ভেঙে
বয়ে চলে অবিরাম।
রাজা বাদশারা কোথায় লুকালো ?
ভাঙা ইমারতে কবুতর বোনে বাসা—
'মরণ জড়ায়ে সাতুরের মসজিদ
মিনার চুঁইয়ে পানি ঝরে নিরবধি।
অতীত স্মৃতির জীর্ণ পাতারা—

জড়ো হ'ল চার পাশে। উড়ে যাক তারা
হাওয়ার ঘূর্ণিপাকে। অবক্ষয়ের
ধূলিকণা অবশেষ, তাই নিয়ে
থাকি নিমগ্ন সারা বেলা।
যে যাই বলুক আনমনে লিখে যাই
ইতিবৃত্ত শাশ্বত নির্ভয়। ৪৪

চাঁদে অবতরণ

মায়ের মধুর গান
শুনেছিনু কবে,— আয় আয় চাঁদমামা
টিপ দিয়ে যারে সোনার কপালে মোর।
বিমুগ্ধ নয়ন মেলি চেয়েছে
মানব শিশু লভিবারে চাঁদের পরশ।
উর্দ্ধে কচি মুঠি তুলি ডেকেছে
তাহারে ; পায় নাই সাড়া তার।
আশা তবু ছাড়ে নাই তারা ;
আশ্রা ফুল মুখ লুকাত
নাম তার করেছে স্বার্থক।
জ্ঞানের আলোক রথে চড়ি
মহাশূন্য ফুঁড়ে, পশেছে চাঁদের দেশে
বুকে তার পদচিহ্ন আঁকি
ফিরে তারা এসেছে আবার
ধুলার ধরণী পরে। চাঁদ থেকে
ধুলিকণা নুড়ির মানিক কুড়ায়ে
এনেছে তারা জয়ের প্রতীক মানুষের,
পতাকা এসেছে গেঁথে চাঁদের জমিতে। ৪৫

'বেগম'-পত্রিকা

অনেক অনেক দিন পরে
বেগম কাগজ এল ঘরে।
পড়ে দেখলাম তার বিশ বছরের
জন্মদিন, দোওয়াই খয়ের
করি তারে, বেগম চিরায়ু হোক।
ঘরে ঘরে মেয়েদের আশা
আকাঙ্খার লেখা আঁকা সব
বুকে করে নিয়ে যাক দূরে দূরান্তরে।
বেগম সার্থক হোক রূপে ও বাণীতে। ৪৬

স্বপ্ন দেখেছিলাম

স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমায় নিয়ে
অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম হে সন্তান,
হে আমার প্রবাসী সন্তান। ফিরে এলে
দূর দেশ থেকে ; হাত বাড়াইল তোমা কাছে আমার
বঞ্চিত প্রাণ আহত আশার পাখীগুলি, ছিন্নপাখা
মেলে দিল দূর নীলিমায়। তোমারি
উদ্দেশে আজ মনে হয় ডানা ভেঙে
প'ড়ে যাবে, ওরা রেখে যাবে মহাশূন্যে
ঝরা পালকের অলেখা স্বাক্ষর।
সে কাহারো চোখে পড়িবে না,
জানিবেনা কেহ সেই অব্যক্ত আর্ত্তির
ইতিহাস। এখানেই বেদনার পাত্র
পূর্ণ করি, চ'লে যাব অন্য কোনখানে।
জ্বেলে যাব নিশীথের তারায় তারায়
মোর শুভ কামনার দীপ পরম্পরা
তোমা লাগি'। স্মরণের ধূলিকণা ভরা
জীর্ণ ঝুলিখানি, রেখে যাব ধরণীর
বুকের অতলে। যাবার বেলায় তবু
বেজে ওঠে ছিন্ন তার বীণা গেয়ে যায়
কানে কানে সেই কথা, অবিস্মরণীয়
স্বপ্ন দেখেছিলাম,—তোমায় নিয়ে
অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। '৪৭

বিয়ে বার্ষিকী

সোনার টুম্পুর বিয়ে বার্ষিকীতে
দেবার মতো কিছুই নেই যে হাতে।
কি ধন দিয়ে দেখব বৌয়ের মুখ
সেই ভাবনায় উঠছে ভ'রে বুক।
মনে মনে অনেক মোতির মালা,
স্নেহে গড়া অনেক হিরের বালা
পরিয়ে দিলাম সোনা বৌয়ের হাতে।
সিঁথির মানিক পরিয়ে দিলাম মাথে।
সোনার টুম্পুর সেহ্‌রা আমামায়
মায়ের দোওয়া ঝলুক অমলতায় ;
মায়ের হাতে নাই যে কানাকড়ি
শুভ দিন তাই শুভেচ্ছাতেই ভরি। ৪৮

কাঁথা বুড়ীর ছড়া

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে
কাঁথা বুড়ী কাঁথা সেলাই করে।
বিড় বিড়িয়ে কয় সে নানান কথা।
তোমরা বলবে ব'কছে বুড়ী যা' তা'।
মূলে কিন্তু যা' তা' মোটেই নয়;
ওরই মাঝে লুকিয়ে আছে বুড়ীর পরিচয়।
যেমন চাঁদের বুড়ী অনন্ত কাল ধরে
বুনছে সুতো চাঁদের কোলের পরে;
তেমনি ক'রে কাঁথা বুড়ীর কাঁথা
স্নেহ মায়ায় ভূবন জুড়ে পাতা।
যেথায় নামে শিশুর খুসির ঢল্
ওদের পায়ের দাপে বিশ্ব টলোমল;
সেথায় বুড়ীর জীর্ণ কাঁথা খানি
ছড়িয়ে র'বে, অনেক ভাগ্যমানি
খুকুমণি কাঁথায় শুয়ে করবে দেয়ালা,
পূর্ণ হবে কাঁথা বুড়ীর সাধের পেয়ালা। ৪১

রং বদলায়

পড়ন্ত রোদের রঙে
আকাশ রঙিন।
পাখীদের নীড়ে ফেরা
দিন পরে দিন।
দেখে দেখে ভাবনার
ডালা খুলে যায়।
ফেলে-আসা দিনগুলি
নীরবে তাকায় :
আমার নয়নপাতে
প্রতিবিম্ব ফেলি'
সুদূর দিগন্ত পারে
ফিরে যায় চলি।
যুগে যুগে মহাকাল
রং বদলায়।
সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি
সে আলোছটায়।
সেই বিম্ববতী আর
মহিষী বিমাতা—
সকরুণ কিংবদন্তী
সেই রূপকথা
অন্যরূপে দেখা দিল এসে
বিস্মৃত স্মৃতির দ্বারদেশে।

বিম্ববতী বসি আজ
স্বর্ণ সিংহাসনে
সুস্মিত আননে
প্রসাদ বিতরে জনে জনে
অন্তহীন সৌভাগ্যের দানে
আছে শান্তি সুখে সম্মানে।
আজ সেই মহিষী বিমাতা
দুঃখভারে লাজে অবনতা।
সে মায়ামুকুর নিরুদ্দেশ ;
শীর্ণদেহ, শিরে রুক্ষ কেশ
প্রসাদ মাগিছে যুক্ত করে
বিম্ববতীর রাজদ্বারে।

মুরগী

সুরমা বাসুর
তিন মুরগী
আণ্ডা দিয়ে
হ'ল কুড়কী।
কুক্ কুক্
কুর্ কুর্ করে ;
পালক ফুলিয়ে
ধুলো ঝাড়ে।
ডিমের ওপরে
বসে দেয় তম।
তিরিক্ষি মেজাজের
বাদসা বেগম।
আশে পাশে
যাবার জো নাই ;
তেড়ে আসে, গলা
বাজখাই।
বাচ্চা ফুটবে
গোল গাপ্পা
তারি তরে
মেজাজটা খাপ্পা। ৫১

বাঘের কথা

টোনা গেল কাঠ কাটতে
বাঘা বললে,—"হালুম।
কি কারনে কাঠ নিচ্ছিস
বল্, না হলে খালুম।"
টোনা বললে, "হুজুর,
নেবেন না মোর কসুর।
টুনি করবে পিঠে,
চাল গুড়েতে মিঠে।"
বাঘা বললে, "বেশ,
পিঠে হলে শেষ
আমায় নিমন্ত্রণ
করবি বিলক্ষণ;
নেমন্তন্নে করবি যদি দেরি
একেবারে দেব সাবাড় করি।
বাপে পুতে যাব পিঠে খেতে,
বাড়ীতে তোর রাখবি পাতা পেতে।"
টোনা তখন ভয়ে ভয়ে কয়,
"হুজুর মা বাপ গোস্তাকি মাফ হয়;
কষ্ট করে ভাঙা ঘরে যাবেন
টুনির হাতের মিষ্টি পিঠে খাবেন
এমন কপাল আমার যদি হবে
কালকে যাবেন বিকেল বেলা তবে।"

তখন বাঘা বল্লে, 'ঘ্যাঁওৎ ঘ্যাঁওৎ
কথা নড় চড়া হলে নির্ঘাত মৃত্যু
বুঝলি ব্যাটা এখন তবে যা ।
তৈরি করগা পিঠে পায়েস চা ।"
টোনা তখন আপন বাড়ি গিয়ে
দেখল টুনি চাল খেজুরের গুড়ে
পিঠে করছে বসে চুলোর পাঁড়ে ;
পিঠের বাসে জিভেয় আসে জল । ৫২

ঈদের ছড়া

আজকে ঈদের চাঁদ উঠেছে
কাল সকালে ঈদ হবে।
নতুন জামায় সেজে গুজে
ঈদ-গাহেতে চল্ সবে।
খুর্মা কাটে সুরমা বানু
লুব্না পাকায় জর্দ্দা।
জুবেদ মিঞা নামাজে যায়
জুনেদ টানে পর্দ্দা।
টিপু বাবু ধিন্‌তা নাচে
রুশো বাবু গান করে।
লুনা বাবু ঢোলক বাজায়
রিঙ্কু সোনা তান ধরে।
ওপার থেকে বাবু মুনি
মনের গাঙে ছিপ ফেলে।
ছিপ নিয়ে যায় কোলা ব্যাঙে-
মাছ নিয়ে যায় গাঙ'চিলে।
চিলের খোঁজে ছুটতে গিয়ে
নাগাল মেলে না।
কেউবা খে'লে ঈদের খানা
কেউবা খেলে না।
ঈদের ভোরে সবাই মিলে
দুয়ার খানি খোল।

মোতাহেরা বানু

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমায়
জাগিয়ে আবার তোল।
তোমরা নাচো তোমরা হাসো
হাসুক মনের সাধ।
দূরের কাছের সবাই নিও
ঈদ মোবারক বাদ। ৫৩
•

আহ্বান

(১)

নেচে নেচে খেলা
করে সুরমা ও লুবনা— ।
খুসিতে রাঙিয়ে তোলে
রংচটা ভাবনা ।
ঝিনুক খুলে
মুক্তা দেব ;
সুরমাকে
চাঁদের আলোর
টিপ পরাব ;
লুবনাকে
গোলাপ ফুলে
গাল রাঙাব ;
মেহদি ফুলে
পা—
কদম ফুলের
পরাগ দেব
কেয়া ফুলের
মা ।

(২)

আয় আয় চলে
আয় সুরমা ও
লুবনা ।

মোতাহেরা বানু

খুসিতে রাঙিয়ে
তোল রংচটা
ভাবনা।
ঝিনুক খুলিয়া
দেব মোতির
মালা;
বেল ফুলে জুঁই
ফুলে সাজাব
ডালা।
তোমাদের দুজনের
খেলার সাথে
আমিও খেলবো
আজ আঙিনাতে। ৫৪

তোমাদের তরে

সুরমা আমার
চোখের কাজল
লুবনা আমার
বেল ফুল
আলো ছায়া ফেলে
দোঁহে নেচে চলে
দেখিনা ওদের
সমতুল।
সবুজ বনের
অঙ্গন থেকে
ভরে নেব মোর
ডালা।
তোমাদের তরে
সোনার সুতায়
গাঁথব ফুলের
মালা।

শুধু, তোমাদের জন্য
নুড়ি কুড়ায়েছি
সাগর বেলায়;
খুঁজেছি কত অরণ্য,—
দেবার মতন

মোতাহেরা বানু

পাইনিত কিছু
তোমাদের মন
তুষিবার মত।
শুধুই শূন্য ঝুলি
এই নিয়ে যাও
পরম আদরে ;
হয়তো তলায় আঁছে
অনাদরে হারান
রতনগুলি।
তোমরা আমার
প্রাণের বৃন্ত হতে
নিয়ে যাও ফুল তুলি। ৫৫

উপহার

সুরমা আমার
চোখের কাজল
লুবনা রূপালি
ঝর্ণা। •
আলো ছায়া ফেলে
দোঁহে নেচে চলে
রূপসী অরুণ
বর্ণা।
সবুজ বনের
অঙ্গন হতে
পূর্ণ করেছি ডালা।
তোমাদের তরে
সোনার সুতায়
গেঁথেছি ফুলের মালা।
হাসি উচ্ছলি
নয়ন উজ্জলি
নান্নুর পানে
তাকাও।
নিয়ে যাও মালা,
নিয়ে যাও ডালা,
আমার আদর
নাও।

মোতাহেরা বানু

হাসি ঝরা সোনা
কুড়ায়ে কুড়ায়ে
ভরেছি শূন্য ঝুলি :
তাই নাও দোঁহে.
হাসি কল্লোলে
সুকোমল হাতে
তুলি'। ৫৬

কণিকা

(১)

সুরমা ও লুবনা ওরা
দুটি বোনে
খেলায় ধুলায় মেতে
থাকে খুসি মনে।
ইস্কুলে যায় নেচে নেচে,
পড়া করে ;
ওদের কথায় –
ওরা কথা কয় যেন
পাহাড়িয়া ময়না।
ওদের হাসিতে ঝরে
মুকতর ঝরণা।
এস এস লুবনা ও সুরমা,
কে নেবে গোলাপ ফুল
তোমাদের সমতুল।

(২)

নিনি সোনার যে
হ্যাপি বার্থ-ডে।
দরজা খুলে দে :
আসুক খুসির ঢেউ,
গোল কোরোনা কেউ। ৩২

সমাদর

নেচে নেচে খেলা করে
সুরমা ও লুবনা
খুসিতে রাঙিয়ে তোলে
রঙচটা ভাবনা।
তোমাদের দু বোনের
চড়ি ভাতি খেলাতে
আমাকেও সাথে নিও
হাসি খুসি মেলাতে।
খুনসুটি মারামারি
ও সবেতে কাজ নাই ;
মিলে মিশে থাকাটাই
ভালো ব'লে সববাই।
তোমাদের কি দেব যে
ভেবে পাইনা কুল,
সাগর ঝিনুকে দিনু
মোতিমালা বায়না ;
চাঁদের সোনার টিপ
কপালে দিলাম
তুলে জোস্নার চিক।
সুরমা লুবনা খুসি
হাসে ফিক ফিক ;

ডালিম ফুলে গাল
রাঙাব,—মেহদি ফুলে
পা,—কদম ফুলের
পরাগ দেবঁ,
কেয়াফুলের
না—। ৫৮

সব ভুলে গেছি

সব ভু'লে গেছি ; কোনো সুখনীড়
ছিল কি ছিলনা ছায়া সুনিবিড়
ধরণীর কোনো কোণে
কিছু তো পড়েনা মনে।
খেলেছিল কিনা শিশুরা সেথায়
হাসি কান্নার দোদুল দোলায়,—
সে কাহিনী মনে হয়
কিছুই সত্য নয়।
সেথা কোনোদিন ঈদ মিলনোৎসবে
সালামে কালামে আনন্দ কলরবে
ভ'রে ছিল কিনা ঘর—
ভু'লেছি পূর্বাপর।
স্তব্ধ অতীত নীরবে তাকায়ে রয়,
গত জীবনের কোনো কথা নাহি কয়।
ভুলের স্মরণ লই,
ভুল ক'রে কথা কই।
মুক্তা ছড়ায়ে স্মরণের বেলা বনে
দু'হাত বাড়ায়ে খুঁজি তারে প্রাণ পণে ;
খুঁজে কূল নাহি পাই,
খোঁজার যে শেষ নাই।
ঘুম কে'ড়ে নেয় রাতের সরীসৃপ ;
ভুলের বাতাসে নিভে নিভে যায় দীপ।

কাফেলা

এ ভুলের বোঝা বয়ে
ক্লান্তিতে পড়ি নু'য়ে।
ভুলের তরণী আশ্রয় দ্বীপ খোঁজে।
তোমারে স্মরিয়া ভুলে ভুলে বাঁশী বাজে ;
তুমি কি দাঁড়াবে এসে
সেই রাজ রাজ বেশে ॥
হাত ধ'রে তুমি নেবে কি আমায় তুলে ?
শেষ সরণীতে বসে আছি সব ভুলে। ৫৭

স্মরণ করি

কাঁচা কবরের মাটির গন্ধ ভাসে।
হিমেল তোমার আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাসে।
আজ এসেছ কি আমার খবর নিতে
ন্যাড়া শিমুলের পাতাঝরা সরণীতে!
বুক-ভাঙা সেই ভুলে যাওয়া কাহিনীর
রোমন্থনে কি ঝরাবে অশ্রুনীর?
হেথা পানি নেই, শুধু বালুকার চড়া,
ফসিলের বুকে জাগেনা—জাগেনা সাড়া।
বিদায়-বিদায় ন' তারিখ জানুয়ারী—
অবচেতনায় তোমারে স্মরণ করি। ৬০

দুপুরের নির্জনতায়

ভরা দুপুরের
নির্জনতা ঃ
শীতের বাতাসে
ঝরা পাতা,
আর এই বিল
রোদে জ্বলে,—
করে ঝিলমিল।
এপারে ওপারে
কয় ক'থা,
ঢেউগুলি বয়ে
যায় বৃথা।
এখানে অতীত
রূপায়নে
তোর কথা পড়ে
যায় মনে।
চলার পথের
পাশে পাশে
পদধ্বনি শুধু
কানে আসে।
মনের ভগ্নাংশ
আশাগুলি,
ভরে যায়
আনন্দে উছলি। ৬১

তুমি কি আসবে

তুমি কি আসবে।
হঠাৎ যদি দেখা
. হয়ে যায় তোমার
সাথে। কি কথা
প্রথম তুমি বলবে ?
আমার চলার
পথে তুমি ও কি
পায়ে পায়ে চলবে ?
কি নামে ডাকবে
মোরে বলো ?
নাম ধ'রে ডাক
দিও, যে পথে
শুকনো পাতা
ঝরে—
হিম পড়ে পথের
দুধারে। ৬২

আসা-যাওয়া

এই আসা আর
ফিরে যাওয়া,
পিছু টানে
ফিরে ফিরে
চাওয়া।
এই মোর
পথের সম্বল।
এ পথে অনেক
যাওয়া আসা
করি,
এর শেষ
অনেক নেই দূরের
পথ—
এ পথ কোথায়
গেছে ?
আসতে আর
ইচ্ছা করে না।
মনে হয় তোমাদের
কাছেই পড়ে থাকি ;
বিরূপ স্বভাব,
কটুভাষে সারাদি ;
লেখার কিছুই
পাইনা।

মোতাহেরা বানু

লেখার মন নেই।
সবুজ বনের
মেহদি গাছটা
হঠাৎ শুকিয়ে
গেল   কত ফুল
ছিল— পাতা ছিল,
কেন এমন হল!
শীতের নিঃশ্বাসে
সব পাতা ঝরছে। ৬৩

তোমার জন্মদিনে

(১)

তোমার জন্মদিনের মহোৎসবে
অনাহুতা এসেছিনু কাল রাতে।
নেপথ্যে ব'সে খেয়েছি অনেক খানা
দোওয়াই খয়ের ক'রে গেছি মোনাজাতে
জন্ম-লগ্নে ঠাঁই হয়েছিল কোথা
বুকের সুধায়।

(২)

তোমার জন্মদিনের মহোৎসবে
অনাহুতা এক এসেছিল ভিখারিণী।
হাতে ছিল তার ছিন্নতন্ত্রী বীণা ;
সুরে সুরে তাই বাজেনি মর্ম্মবাণী।
তোমা সাথে তার নেই কোন পরিচয়,
অলক্ষ্যে তাই ঝরাল চোখের পানি। '৩৪

বিবাগী দিন

এসেছ আবার হে বিবাগী দিন।
এই দিন
ফুরাবেনা,
শেষ হবে না যে অন্বেষার।
তবু কেঁদে মরে নিহত আশার
অনুক্ত ব্যথা।
তোমারেই যেন আজ বারে বারে
মনে পড়ে যায়।
মনের কথারে ঠিক রূপ দেওয়া—
তুমি যবে কাছে ছিলে।
লিখলেই লেখা হয় না—
হে বিবাগী দিন, ন তারিখ জানুয়ারী। ৬৫

এসে যদি দাঁড়াতে

তুমি এসে যদি দাঁড়াতে
শ্যাম বনাণীর ছায়াতে !
বাসনা মেলিত পাখা ।
তোমা হাতে হাত রাখা ;
আমি মরুভূমি পারায়ে
আসিতাম বাহু বাড়ায়ে ;
এই বিজন বালুর চড়াতে
তুমি এসে যদি দাঁড়াতে ।
ক্ষত পা' তুখানি বাড়ায়ে,
বাধা বন্ধন ছাড়ায়ে
আসিতাম ছুটে তোমা কাছে ।
আমি তোমা হাতে হাত রাখিতাম,
তোমাকেই ভাল বাসিতাম ;
আবার বাসনা মেলিত পাখা,
ফুলে ভরিত রিক্ত শাখা । ৬৬

(১)

ভেসে-চলা জীবন

(১)

ভাসাও তোমার তরী অতলান্ত
জলে। সেহালা বিমর্ষ কেন
পঙ্কিল পল্বলে। ঢেউয়ে ভেসে
যাও অথই সলিলে ; এইতো
নিয়তি তোর ; ভেবে ফল কিবা
এ ঘাটের ঢেউয়ের আঘাতে
ভেসে চলা অন্য কোন ঘাটে।
নাহি নীড় আশ্রয়ের সে ভাবনা, —
মিছে ভেসে চলা, সে পরমা
গতি তাতেই সন্তোষ মানে।
দূরে বা নিকটে যেথা যাও
ঢেউ আছে ; আছে স্রোত
জীবন-হিন্দোলা ; তাই নিয়ে
জীবনের ভরে ওঠে মেলা।
কেহ যদি নাহি ডাকে, আছে
নদীজল। ভেসে চলা জীবনের
সেই তো সম্বল।

(২)

ভাসাও তোমার ভেলা
অতলান্ত জলে।

কাফেলা

সেহালা বিমর্ষ কেন
পঙ্কিল পল্বলে !
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চল
অজানার টানে ;
শুরু নেই—নেই শেষ
জীবনের গানে।
এ ঘাটের ঢেউয়ের আঘাতে
ভেসে চলা অন্য কোনো ঘাটে।
সেহালার সে পরমাগতি
লেখা আছে কণ্টক-ললাটে।
নাহি সাধ নীড়-রচনার—
তাই নিয়ে থাকি
নিমগ্ন সারা বেলা। ৬৭

খুঁজে ফিরি

সারাদিন রোদ খা খা করে,
দাঁড় কাক ডাকে কা'— কা কা করে।
গাছপালা উত্তুরে বায়ে দোলে,—
হিমেল হাওয়ায় পাতা ঝরানোর গান।
নীল আকাশেতে চিল ওড়ে অবিরাম ;
দুপুর রোদের খা খা করা দিনমান।
ঘর ছাড়া মন :
মনের মুকুরে
তোমার কথা মনে পড়ে।
দুপুরে কিংবা রাতের অন্ধকারে—
রোদ নিভে-আসা
বিষণ্ন বৈকালে
মন শুধু তোমাকে খুঁজে ফেরে।
কোথা গেলে দেখা
পাওয়া যাবে! ৬৮

দিশাহারা হ'য়ে খুঁজি

কুমারের পাড়ে ছিল ঘরখানি ;
মাগো তোমার ভরা সংসার ছিল।
কত বর্ষায় শরতে ও শীতে গেছি
মা তোমার কাছে দেখতে ও দেখা দিতে।
আদর করেছ মিষ্টি আলু ও রসের মিঠায়,
সে আপ্যায়ণ আজো মনে পড়ে। অনেক
দিনের আনন্দ-কল-কাকলিতে ভাই ছিল
আর বোন ছিল ; তুমি ছিলে
বাবা ছিল স্নেহময়, আজ কিছু নাই।
তাল গাছে দোলে পুরানো বাবুই বাসা,
সে ঘাটে নৌকা আজো আসে পাল তুলে।
তোমার পায়ের ধুলো মিশে আছে
নদীর বালুকা তটে ; আজকে তোমাকে
ডাকি মা আমার ; কোথায় গিয়েছ চলে
আজ অমারাতে দিশাহারা হ'য়ে খুঁজি। ৬১

ঘুম ভেঙে যায়

থেকে থেকে মধ্যরাতে
ঘুম ভেঙে যায়। নবরক্তে
যুগের কল্লোল-ধ্বনি শুনি।
পুরাতন জীর্ণ স্তম্ভ ভেঙে
যাক, তাতে ক্ষোভ নেই;
আবার নতুন হাতে নতুন
গম্বুজ সৃষ্টি হবে নব রূপায়ণে।
আপাততঃ সেটাই সান্ত্বনা।
নবযুগ অশ্ব-খুরাঘাতে
জ্বলে চকমকি হৃদয়ের;
পাষাণ প্রাকারে জাগে
প্রতিধ্বনি তার। প্রেতের
নৃত্যের আস্ফালনে
তাকাই বিমূঢ় চোখে।
নীলাকাশে লাল নীল
আলোর ঈঙ্গিত দেখা যায়।
মগজের কোষে কোষে
অশ্বের হ্রেষা আর মত্ত
হস্তিনীর বৃংহিত-ধ্বনি
গর্জ্জমান। ৭০

কে দেখাবে পথ

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। –
কোন্ পথে-আলো কি আঁধারে !
দিকভ্রান্ত বলাকার পাখা।
পুড়ে যায় ; দগ্ধ নীলাম্বরে
চেয়ে দেখি, নক্ষত্র মেলায়
দগ্ধ হৃদয়ের ভস্মস্তূপে
জন্ম নেয় স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী সিক্ত করে ;
মুক্ত বায়ু বহে পূর্ব্ব দিগন্তের দীপ্ততালে।
শুকতারা স্নেহজাল বোনে।
জুড়ায় শরীর মন পূর্বাশার আলো।
রাতের দুঃস্বপ্ন কাটে।
ঝড়ের আকাশে
পাখী মেলে দিল পাখা ;
মহাশূন্যের নিঃসীম নীল কোলে
আশ্রয় খোঁজে নীড়হারা প্রাণপাখী।
মেঘাড়ম্বরে অম্বর ধ্বনিময় ;
কে দেখাবে পথ, —তিমির রাত্রি। '৭১

ঈদ আসে

নীল আকাশের সিঁথির
মানিক দুলছে ঈদের চাঁদ।
খুস্ আমদেদ জানাই তোমায়,
নিখিল প্রাণের সাধ।
বর্ষ শেষের অমৃতে অবগাহি
নুতনের বেশে দেখছ সবারে চাহি ;
বছর বছর তুমি আসবে, ঘুরে,
যে ফুরিয়ে গেছে সে তো আসবে না ফিরে
গোলাপের কুঁড়ি শুকায় পাতার আড়ে ;
আনন্দ হাসে বেদনার উপহারে।
ঈদ আসে বারে বারে ;
তোমার যাবার পরে
তুমি নাই তবু ঈদ আসে,
আকাশের কোলে চাঁদ হাসে। '৭২

ছায়া ফেলে

মেঘে মেঘে ক্ষণপ্রভা
বিজলি চমকে।
ক্ষণে ক্ষণে মনের দর্পণে
লিখে চলে।
মনে পড়ে
কায়াহীন ছায়ার শরীর
মনের দর্পণে করে ভীড়।
কারা যেন আসে যায়!
অস্থির গোপন সঞ্চরনে
কারা নয় ছায়া ফেলে। ৭৩

যদি দাঁড়াতে

তুমি এসে যদি দাঁড়াতে
ভাঙা কুটীরের ছায়াতে
ক্ষণিকের তরে ভুলে।
গাওয়া গান পড়তো
মনে, হাতে হাত রেখে
দাঁড়াতাম সেই শুভক্ষনে
আমার তরুর ছায়াতে
শুধু তুমি এসে যদি
দাঁড়াতে! একবার যদি
দাঁড়াতে! ৭৪

তুমি নাই

তুমি নাই, তবু
অনেক ঈদের দিন
ঘুরে ফিরে আসে বার বার।
রমজানের সিয়ামের শেষে
বয়ে আনে ঘরে ঘরে
হাসি ঝরা সোনার প্রভাত ;
নতুন কাপড় পরা শিশুদের
খুসির কল্লোল। ঈদের নামাজের
শেষে সালাম কালাম
সেই কোলাকুলি মেলামেশা
সবই তেমনি আছে, শুধু

কাফেলা

তুমি নাই। যারা আজো
ভালোবাসে তাদের মমতা
ঘিরে রাখে বেদনার
অগ্নিদাহ হতে।
তাই ভুলের শরম নিয়ে
ভুলে ভুলে কথা কই। ৭৫

স্বেচ্ছা-নির্বাসন

এই যে আমার স্বেচ্ছা নির্ব্বাসন,—
স্তরে স্তরে সাজিয়ে-রাখা দুঃখ অগণন :
এদের আমি কোথায় দেব স্থান ?
কে কি দেবে এদের মূল্যমান,—
ভাবনা আমার তাকায় আকাশ
পানে, জানিনা যে কিসের
অন্বেষণে !
তোমাদের কাছে বলবার মত
একটা কথাও পাইনা।
তোমাকে ঘিরিয়া ছিল
আশা ভালোবাসা
ঈদের উৎসব। আজ কিছু নাই।
নিভে যাওয়া প্রাণের
তরণী বোঝাই ভুলের
আশ্রয়-দ্বীপ খোঁজে।
তোমারে স্মরিয়া ভুলের বাঁশরি বাজে,—
নিয়ে যাও তুমি মোরে। ৭৬

সুপ্ত অতীত

(১)

মন তবু খুঁজে ফেরে,
সেই ভুলে যাওয়া ছোট্ট কুটির
সেই খানে।
তুমি নাই, তবু
ঈদ আসে বারে বারে।
হাত ধরে তুমি নেবে কি
আমারে এসে ?
শেষ সরণীতে বসে আছি
বেলাশেষে ভুলের উর্ণা-জালে।
ভুলের সাগরে ঢেউ ওঠে পড়ে,
চেতনারে মোর বিলুপ্ত করে।

(২)

তুমি নাই, তবু
অনেক ঈদের দিন
ঘুরে ফিরে আসে বারবার ;
বয়ে আনে ঘরে ঘরে
সোনালি প্রভাত,
শিশুদের কলহাসি,
নতুন কাপড়ে সালামে কালামে
সুপ্ত অতীত নীরবে তাকায়ে রয়।
মোর জীবনের কোন কথা নাহি কয়। ৭৭

আমন্ত্রণ

ছ'য়ের পরে নয়
খুসির তুফান বয়।
তোমরা আমার ঈদ
মন মহলের ভিত।
ঈদের নামাজ পড়ে
আয়রে হেসে ঘরে।
সেমাই খেয়ে যানা
ছোকন মিঠু লুনা। ৭৮

ঈদ উৎসবে

জীবনের যত ঈদ উৎসব
এসেছিল ঘরে
চাঁদ দেখে করেছি যে
মোনাজাত।
অঙ্গে অঙ্গে ঈদের আতর
খুসবু জড়ায়ে,—
অঙ্গে অঙ্গে খুসবু জড়ায়ে
আসে কত স্মৃতি হাত বাড়ায়ে।
মনে পড়ে যায় কত ভুলে-যাওয়া
ঈদের খুসির আড়ালে
অনেক ব্যথার পাহাড়ের পরে
ঈদের চাঁদের আলো ঝরে পড়ে।
তোমরা আছ তাই ঈদ আছে। ৭৯

স্মরণ

মুক্তা ছড়িয়ে স্মরণের বেনাবনে
দুহাত বাড়িয়ে খুঁজি তারে প্রাণপণে।
আবার ভুলিয়া যাই
পিছনে ফিরে তাকাই
ঘন কুয়াসায় দৃষ্টি ব্যাহত। ৮০

•

জেগে ওঠে সবুজ বনানী

কত যুগ ধ'রে তোমার
হাত ধরে পথ চলেছি ;
দুর্ব্বল হাতটি মোর,—
তোমার সবল আকর্ষণে
এগিয়ে চলেছি ক্ষণে
ক্ষণে ; পথ দেখি নাই ;
শুধু তোমারে দেখেছি।
আজ কোথা চলে
গেছ ? কোন পরপারে
তোমার চলার বেগে
তাল মিলিয়ে চলতে
পারিনি। তাই আজ
একা পথ চলি।
মনে মনে বার বার বলি,—
আজ যদি দেখা হ'য়ে
যায় তোমা সাথে
চিনে নিতে পারবে কি
সাঁঝের আলোতে !

মোতাহেরা বানু

ভুলে-যাওয়া পথিকের
চেনা পদধ্বনি
বাজে কানে ; বয়ে যায়
উদ্বেল তটিনী,—
মনের দু তীর ভেঙে চলে।
জেগে ওঠে সবুজ বনানী
যেখানে বালির চড়া ছিল। ৮১

স্মৃতি

তুমি ভালবেসে ছিলে
তার এক কণা
কেহ বাসিবে না।
মোর শত অপরাধে
করেছিলে ক্ষমা।--
লাখে না মিলিবে
তার একক উপমা।
স্নেহ প্রেম নির্ঝরিণী
স্রোতে অবগাহি
দেখিলাম মৌননেত্রে
মুখপানে চাহি।
আশার স্বপন
লেখা ছিল
সেই চোখে। ৮২

বাস্তব

যা বাস্তব তা বড় নির্ম্মম :
তাই কল্পনার কাছে চাই আশ্রয়—
আশ্রয় চাই।
তুমি আমাকে আশায় উজ্জ্বল
ভরসায় নির্ভর পথ দেখাও।
যত নৈরাশ্য যত বঞ্চনার
ক্ষত মুছে দাও।
তোমাকে নিয়েই আমি সব
ভুলে যেতে চেষ্টা করবো।
যা' কিছু বাস্তব সে তো নির্ম্মমতায়
নিষ্ঠুর। সেখান থেকে স'রে স'রে
মন কল্পনার রঙিন পাখায়
ভর করে উড়ে যেতে চায় দূরে
আরো দূরে :
যেখানে নীল আকাশের স্বপ্ন
হাতছানি দিয়ে ডাকে।
মনটা একটা সমুদ্র, তার
কুল নেই, তল নেই, আছে শুধু
আলোড়ন।
তবু তার শুভ্র ফুল বাসে
রজনীরে ধন্য করে আপন
গৌরবে। ৮৩

কে ডাকে

রজনী গন্ধার রং নেই,
তবু মঁধু সুবাস সম্ভারে
রাতের মিটায় সাধ।
বাতাসে সৌরভ ভাসে তার
রাত জাগা চোখে ঘুম নামে।
মনের অনেক কাছাকাছি
তারে বুঝি মৌন অনুভবে ;
যে দুয়ারে তালা ঝুলছিল
খুলে গেল সুরভি নিঃশ্বাসে।
কে ডাকে রাতের অন্ধকারে।
নৌকাতে সাদা পাল তুলে !—
রঙ নেই শান্তির
নিশান ওড়ে শুধু।
নীরব রজনী গন্ধা
রজনীর নর্ম্ম সহচরী। ৮৪

সপ্ত তরঙ্গ

(১)

চাঁদ হাসবে—ঈদ আসবে বারে বারে :
খুসির সওগাত এনে দেবে ঘরে ঘরে।
তুমি শুধু আসবে না ;
চাঁদ-রাতে লও সালাম।
কবে কোন দিন ঈদ এসেছিল,
বাগানে খুসির ফুল ফুটেছিল !

মোতাহেরা বানু

(২)

বাসি ফুলমালা
জড়ায়ে গলায়
কি লাভ হবে !
তার চেয়ে চলো
আকাশ-কুসুম তুলি
বর্ত্তমানের পটভূমিকায়।

(৩)

আমি বিগত স্বপন ভুলি
আকাশ-কুসুম তুলি ;
ভরাই শূন্য ডালা
তাই দিয়ে গাঁথি মালা

(৪)

আমি অতীত স্বপন ভুলি
শুধু আকাশ-কুসুম তুলি ;
ভরাই শূন্য ডালা
তাই দিয়ে গাঁথি মালা
সকাল সন্ধ্যা বেলা।

(৫)

নিভে-যাওয়া আলো ফিরে
জ্বালাবার ব্যর্থ কামনা ঘিরে
মুকুলিত শাখা ঝড়ে
ভেঙে পড়ে বারে বারে।
সোনালি স্বপন তবুও
মরেনা।

(৬)

তুমি নিয়ে যেয়ো
ভালোবেসে
মোর মালা হেসে
হেসে ;
পরিও তোমার গলে
তিতিয়া নয়ন জলে।

(৭)

মন না চাইলেও যেতে হবে
সব ছেড়ে, আর
আমি যাব না তোমার
সামনে ; জ্বলছে দুস্তর
মরু-বালুকার বিস্তার।
সমুখ
কাঁদে সুদূর অতীত লাগি ;
মন চায়না, তবু চলি
তোমাদেরে শুধু ছলি।
বারে বারে আসা-যাওয়া,
কিছু পাওয়া, কিছু না পাওয়া,
ছকে বাঁধা মন মুক্তি চায়। ৮৫

একদা ও আজ

একদা সুকন্যা ছিনু।
পিতা ও মাতার কোলে
লালনে পালনে স্নেহমায়া,
আলিম্পনে বেড়ে ওঠা
অঙ্কুরের প্রায় বেড়ে উঠেছিনু।
তার পরে জানা অজানার
গতি পথে কবে হয়েছিনু
গৃহবধূ। যুগান্ত কালের
কথা আবছা আলোকে
মনে পড়ে। সেদিনের
আলোক শয্যায়
বেজেছিলো মধুক্ষরা
জীবন শাহনাই। সুখী
হয়েছিনু। আপনার
কুটীর অঙ্গনে ফুটেছিল
অনেক কুসুম কলি।
সুখে ঘর বেঁধেছিনু আশা
স্বপ্নে ভরপুর। কত
যুগ কেটে গেছে তার সাথে
স্বপ্নে ও মায়ায়। ৮৬

ফেলে-আসা অতীত

কোথায় যেন যেতে ইচ্ছে করে,
অবুঝ মন বাধা মানতে নারাজ।
রোদের মেজাজ চটে আগুন ছড়ায়,
অতীতের সুর বাহার ভেঙে খান খান।
মগজের জলসায় কারা যেন
নাচে বল নাচ। ওরা কারা? ওদের
চেনা চেনা মনে হয় তবুও চিনিনা;
রোদপোড়া সন্ধ্যা রোরুদ্যমান।
বেলা শেষে ক্লান্ত চিল পাখনা গোটাল;
এখন তোমার ছড়ান মনের টুকরো
গুলো কুড়িয়ে তুলে নাও
কোনো সোনার কৌটায়।
মেঘে মেঘে আফিম ফুলের
লাল আভা; ঝোপে ঝাড়ে অন্ধকার
চুপিসাড়ে নামে; কালো আঁচল বিছায়।
এক ঘেয়ে জীবনের জের টেনে
চলার বিরাম নেই; তাই বসে আছি
অতীতের ফেলে আসা পথে।
মেঘে মেঘে সূর্য্যাস্তের লাল রং,
ঝোপে ঝাড়ে কালো আঁধার। ৮৭

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

(১)

সুপ্ত চেতনা দেয়না সদুত্তর।
সুপ্ত চেতনা দেয়না তো সে খবর
কোথায়
কিছু তো মেলে না।
অবচেতনায় সেকথা অবান্তর ;
মনে হয় যেন সকলি অবান্তর :
মন বলে যেন সকলি অবান্তর।

(২)

আপন ভুলানো খেলা
খেলে চলি সারা বেলা।
হারিয়ে যাবার খেলা
খেলে চলি সারা বেলা।
আপনা হারিয়ে খুঁজি
আর্ত্ত নয়নে সুদূরের পানে চাই ,
সেথা ওড়ে শুধু বাসনার পোড়া ছাই।
সে ছাই কুড়ায়ে আনি
ভরিয়া আঁচল খানি।

(৩)

আর্ত্ত নয়নে যত দূরে ফিরে চাই ;
ওড়ে শ্বাস রোধি বাসনার পোড়া ছাই।
আর্ত্ত নয়নে সুদূরের পানে চাই,
সেথা ওড়ে শুধু বাসনার পোড়া ছাই।
নিজেরে হারায়ে খুঁজি
হাতে কিছু নাই পুঁজি। ৮৮

কে তুমি

আমার কান্না ভেজা
ভাবনা গুলোকে হাসিয়ে
দিতে চাও ? কে তুমি সোনার
কাঠির ছোঁয়া লাগিয়ে
আমার শুকনো বালুকণার
স্তূপের তলায় কুলু কুলু ধ্বনি তুলে
ফল্গুধারা বইয়ে দিতে চাও
কে তুমি ?
তোমাকে হৃদয় দিয়ে
অনুভব করতে পারছি ;
কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনা
তুমি আমার ধরা ছোঁয়ার
বাইরে। তবু চিনতে ভুল
হয়নি। আমার আঁধার
জীবনে আলোর বাতি
জ্বালাতে চাও কে তুমি।
এসেছই যদি
তবে আমার অশ্রুধারাকে
হাসির মানিকে রূপ দাও। ৮৯

মনের স্বপন

লিখতে গেলে কিছুই লেখা হয়না।
মনে আছে অনেক কথার মালা,
কিন্তু তাকে রূপ দেওয়া ত যায়না।
নয়তো সোজা লেখা জোখার খেলা
লিখতে জানিনা ; তবু মনে
আসে, অতীতের ভুলে যাওয়া
গান, কত হাসি—কত কান্না
রোদে ঝলসায় আকাশ মাটির
কোল।
এই রোদ, এই চৈতি হাওয়ার
এই বিল চলে বাঁকে বাঁকে
কোন দূরে।
টিয়া পাখী মন শুধুই শিকল কাটে।

(২)

আমি যে কোথায় আছি
বুঝতে পারিনা কিছু আজ।
আয়ুষ্কাল শেষ
ক্ষীনায়ু প্রদীপ খানি বার বার
নিভে নিভে যায়।
তৈলহীন প্রদীপের শিখায় শিখায়
শুধু কালি ঢালে, আলো নাহি দেয়! ৯০

মনে পড়ে বুঝি

(১)

আমার অন্তর তলে অশ্রুজলে স্নাতা
কাঁদে বসে মোজেসের মাতা।
সন্তানে ভাসায়ে জলে নীল নদী তীরে
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখে কোথা যায় ফিরে।
পাপিয়াস পেটিকার সাথে সাথে
ভেসে যায় মন।

(২)

মন পবনের নায়ে চড়ি কোথা চলে যাই !
বিষন্ন সন্ধ্যায় নেমে আসে
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার কালো ;
মেঘে ঢাকা আকাশ অঙ্গন
চাঁদ তারা নাহি দেয় আলো।

(৩)

বালুচর শুধু কাঁদে,
গত জীবনের কথা
মনে পড়ে বুঝি।
এখানেও নদী ছিল একদা,
আজ বালুকণা কাঁদে
বিগত স্বপ্ন সাধে।

(৪)

বালুচর শুধু কাঁদে
অতীত স্বপ্ন বুকের তলায়।

কি স্বপ্ন দেখে কেউ জানেনা
ভরা দুপুরের রোদে জ্বলে
বালুকণা ;
অশরীরি হাওয়া চলে। ৯১

শেষের কথা

শেষের অধ্যায়ে এসে চলা শেষ হ'ল।
সমুখে ফেনিল সাগর ফুলছে।
তোমাকেই খুঁজে—
মগ্ন চেতনায় শুধু তোমারি অন্বেষা
জাগে। শুনি কানে সেই মধুভাষা ;
মনে পড়ে দুঃখ-সুখে-মেশা দরিদ্র কুটির
একখানি। মায়াময় শান্তি সুখ নীড়।
ছিল কোনোদিন শিশুদের কাকলি-মুখর
কলরবে ভরেছিল ছোট সেই ঘর। ৯২

বিদায়ী কাফেলা

একটি বিষন্ন সুর
ধ্বনিয়া উঠিছে বারে বারে ;
রিক্ত করি আপনারে
যেতে দিতে হবে সবাকারে।
যাত্রালগ্ন সমাগত ;
বিদায়ী কাফেলা
চলে যায় মোরে ফেলি
নিঃসঙ্গ একেলা।

কাফেলা

পশ্চাতে রাখিয়া যায়
প্রিয় নামগুলি ;
দিবসের শূন্য পাত্র
সেইনামে ভরিয়ে যে তুলি।
নেপথ্যে মিলায়ে যায়
ও কাদের ক্লান্ত পদধ্বনি !
দিনে রাতে সে আওয়াজ
কান পেতে শুনি আর শুনি ;
সেই মোর জীবনের
পরম পাথেয়
হ'য়ে র'বে চিরদিন
অবিস্মরণীয়।
তোমাদের প্রতীক্ষায় কেটে যাবে
কত যুগ—কত বর্ষ মাস ;
হয়তো ফুরাবে এই
বাঁচিবার নিষ্ফল প্রয়াস।
আর যদি কোনো দিন
তোমাদের দেখা নাহি পাই,
ধরণীর ধুলি মাঝে
মিশে যদি ধুলো হয়ে যাই,
তবু তোমাদের পথে
জ্বেলে যাব কল্যাণ-দীপিকা ;
লিখে যাব দীপ্তভালে
অমেয় প্রাণের জয়টিকা। ৯৩

প্রশ্ন

তোমরা সবাই চললে
আমায় ছেড়ে
শান্তি স্বপন কেড়ে
দূরান্তরে সে কোন
সোনার দেশে
চললে নিরুদ্দেশে,
আমায় একা ফেলে
অতল অন্ধকারে।
নিরুদ্দেশের পথে
নেপথ্যে মিলায়ে যায়
ও কাদের ক্লান্ত পদধ্বনি।
থরো থরো কাঁপে মোর
বিশীর্ণ ধমনী।
কোনদিন ফিরে এসে
মা ব'লে কি ডাকিবে
আবার?
শূন্যঘরে প্রতিধ্বনি
ঘুরিয়া ফিরিবে
বার বার! ৯৪

স্ফুলিঙ্গ

(১)

তোমরা সবাই চ'ললে
আমায় ছেড়ে,
শান্তি স্বপন কেড়ে
নিরুদ্দেশের পথে।
শেষের অধ্যায়ে দেখি
পট পরিবর্ত্তনের
আয়োজন শুরু হ'ল
নেপথ্য সঙ্গীতে।
ধ্বনি তার শুনিবারে পাই ;
আমি ডুবে যাই এক অন্তহীন
আঁধার অতলে।

(২)

এর আগে চ'লে গেছে
অনেক কাফেলা ;
তাদের চলার পথে চেয়ে
বসে আছি নিঃসঙ্গ একেলা।
রেখে গেছে প্রিয় নামগুলি;—
সায়াহ্নের বিষন্ন আলোকে
পড়ে চলি সেই নাম।
আমার সে শেষের সম্বল
হৃদয়ের শীলাতলে সে

ডোবায় শরীর মন
আমার যতেক আকিঞ্চন।
তোমাদের পায়ে পায়ে
চলে অণুক্ষণ,—
নেপথ্যে মিলায়ে যায়
ও কাদের দৃপ্ত পদধ্বনি!
বিদীর্ণ হৃদয় তলে
সেই মোর বিশল্যকরণী।

(৩)

মানস লোকের
অলিগলি খুঁজি
শুধু তোমাদের
জন্য।
কিছু পাইনি ত
তোমাদের মন
ভোলাবার মত।
একা একা পথ চলি
এ পথ চলার শেষ নেই।
তবু চলি দীর্ঘ
অনেক দিনের একা
পান্থ চলা।
চলতে চলতে পথে
দেখা পাই যদি! ৯৫

অন্তর্ধান

ঈদকে আমার
করে খান খান
তোমরা কোথায়
করলে অন্তর্ধান।
তোমাদের সব
ফেলে যাওয়া আসবাব—
কোথা গেল ওরা
জিজ্ঞাসে সে জবাব।
পারিনা বলিতে,
দিতে পারিনা যে
সে কথার উত্তর
ভেসে ভেসে কোথা
ডুবেছে আশার ঘর।
মোর সেমাইয়ের পেয়ালা
ভরেছে চোখের পানি ;
লোনা স্বাদে ভরা উঠেছে
আমার কণ্ঠখানি ৯৬

লাখো সলাম

লাখো শহীদের
খুন রাঙা পথে
জাগিয়া উঠিল কারা
ভীতি-বন্ধন-হারা।
ওরা মুক্তি পাগল
মুক্তি সেনার দল, —
মজলুম বাঙালীর
বুকের ভরসা বল।
তুলে নিল শত
বজ্রমুঠিতে
আগ্নেয় হাতিয়ার ;
খুনি জল্লাদ
পশু সেনাদের
দিয়েছে উল্টো মার,
স্তম্ভিত করি
বিশ্বের দরবার।
জীবন-মূল্যে
ছিনিয়া এনেছে
স্বদেশের স্বাধিকার—
অনেক মূল্য তার।
তুচ্ছ ক'রেছে
অত্যাচারীর
গোলাগুলি বেয়োনেট।

কাফেলা

জান কুরবান ক'রেছে,
তবুও মাথা করেনি ত' হেঁট
বাঙালীর ভীরু নাম
ঘুচায়েছে নিজ হাতে
গড়ি শৌর্যের বুনিয়াদ।
দেশের আজাদী
এনেছে মুক্তি-সেনা;
বাঙালী খোকন
সেনারা জিন্দাবাদ।

বাঙলার জয়
পতাকায় লেখা
তোমাদের প্রিয়নাম।
একাত্তরের
গাজী ও শহীদ
সবার স্মরণে
জানাই হাজার
লাখো সালাম। ৯৭

ছড়া

বাবু মুনির জন্য

এবার বর্ষায় আমাদের পাশের মাঠের ডোবা থেকে অনেক কোলা ব্যাং ডাকতো। আমি যেন শুনতাম ওরা বলছে :

ইয়াহিয়ানে ইয়ে কেয়া কিয়া
পাকিস্তান কো ডোবা দিয়া ?
কোই জান লেকে ভাগা,
কোই ডর সে মাফি মাংগা ;
ইয়াহিয়া টিক্কা নিয়াজি রাও ফরমান
বাংলা মুলুক কো বানায়া গোরস্তান। [১৮]

যুদ্ধ

ইয়াহিয়ানে কেয়া কিয়া
সাব বাঙ্গালীকা জান লিয়া।
খানাপিনা বন্দ কিয়া,
রুপিয়া পাইস ছিন লিয়া,
কোই জান লেকে ভাগা,
কোই ডরসে মাফি মাংগা। [১৯]

পহেলা বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ
সায়াহ্নের আলো-
আঁধারিতে, অমৃত-
পাত্র হাতে এসেছিলে
দুয়ারে আমার,
হে পথিক জীবনের
প্রথম পথিক !
ভরেছিলে কানায়
কানায় জীবনেরে ;
ধরেছিলে মুখে
জীবনের সুধাপাত্র।

পহেলা বৈশাখ
ফিরে আসে
বারে বারে।
দিনে রাতে মাসে
বর্ষে শেষে
পহেলা বৈশাখ
ফিরে আসে।
ভুলে যাওয়া
স্বপ্নেরে স্মরিয়া
উঠি চমকিয়া।

মোতাহেরা বানু

এটা যেন কিসের
তারিখ ছিল !
স্মরণীয় দিন
হারিয়ে ফেলিছি ;
কিছু অমূল্য
সম্পদ সীমাহীন
তারে যত খুঁজে
ফিরি, দূরে সরে
যায় ; দূর নীলিমায়
কি স্বাক্ষর রেখে
যাব ! ১০০

ঈদ মুবারাক

ঈদের খুশির স্বপ্ন আমার
বেড়ায় ঘুরে ফিরে
দূর বহু দূর দেশে দেশান্তরে।
কোথায় থাকে রুশো টিপু
কোথায় নিনি সোনা
কোথায় থাকে
মিঠু ছোকন লুনা।
রিঙ্কি কোথায়
খেলছে বসে,
বাবু মুনি গাইছে কোথায় গান,

সেইখানে মোর
যায় ভেসে মন-প্রাণ।
ঈদের খুশির ফসল আমার
তোমা সবার তরে।
ছড়িয়ে দিলাম
আকাশ বাতাস ভরে
তোমরা যারা আছ আমার
চোখের অন্তরালে,
জেগে আছ ব্যাকুল ভাবনায়,
নিত্য সেথায় আমার
যাওয়া-আসা মন-পবনের নায়।
মিমি সোনা আছে
কোলের কাছে,
চোখের সীমায়
একটি মানিক জ্বলে ;
সেই তোমাদের সবার হয়ে
আজকে ঈদের দিনে
আমার খুশির
বন্ধ দুয়ার খোলে।
ঈদের ভোরের
সোনা-আলোর সুখে
ঘরে ঘরে ভাঙলো
খুশির নিদ।
কাছে এবং দূর-প্রবাসে

মোতাহেরা-বানু

যেথায় আছ যারা,
নিত্ত আমার
দোওয়া সালাম
ঈদ মুবারাক ঈদ ১০১

স্বপ্নের ফুল

ভাবনার মেঘে ঝড় উঠবে কি!
আমার আকাশে কালো মেঘ—
কথায় কথায়
চিন্তার সুতো জটিল জটায় বাঁধা;
একথা সেকথা আসে আর
উড়ে যায়। স্বপ্নের ফুল
স্বপ্নেই ফোটে ভালো,—
সাদা চোখে তাকে দেখতে
পাওয়াই ভার। ১০২

চড়ুই

(১)

দিন ভোর চড়ুইয়ের
চিকির চিকির ;
কি ক'রে বুনবে বাসা
খুঁজছে ফিকির।
যেই তুমি বুজেছ কি
চোখের পাতা,
ধুলো বালি যা' তা
চোখে মুখে ফেলে দিল।
ভয়ে ভয়ে দরজায়
এঁটে দেই খিল।
জানলার ফাঁক গ'লে
চড়ুই মিছিল
ঢুকে প'ড়ে কামরায়;--
করে ফর ফর,
মনে হয় এটা যেন
ওদেরই ঘর।
আমি যেন উড়ে এসে
জুড়ে বসেছি ;
ওদের হকের ধনে
ভাগ কেটেছি।
সেই মত বুঝে শুনে
ক'রছে জুলুম

ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজেতে
কান খোয়ালুম।
পেছনে লেগেছে যত
চড়া কমবখতা
মন চায় মেরে ধ'রে
করে দিই তক্তা।
কিন্তু আমার নেই
যন্ত্রি ও যন্ত্রা।

(২)

তোরা অতি নচ্ছার
পাখি।
সারাদিন শুধু দাগাবাজি
খড়কুটো ঠোঁটে নিয়ে
চিকির চিকির।
আমার ঘরেতে বাসা
বাঁধার ফিকির।
চোখের দু'পাতা
এক করে কার সাধ্যি।
এক গাদা ধুলোবালি
ঢেলে দেবে সদ্য।
চোখ রগড়ান সার
অনন্ত উপায় ;
হাল ছেড়ে দিয়ে করি
হায় হায় হায়।
চড়ুয়ের জুলুমেতে

কাফেলা

সারাদিন ভোর
নিজের ঘরেতে আমি
হয়ে আছি চোর।
ভয়ে ভয়ে দরজায়
এঁটে দিই খিল,
জানলার ফাঁক গ'লে
চড়ুই মিছিল
ঢুকে পড়ে কামরায়
করে ফর ফর।
মনে হয় এটা যেন
ওদেরই ঘর।
আমি যেন উড়ে এসে
জুড়ে বসেছি ;
ওদের হকের ধনে
ভাগ কেটেছি।
মনে মনে বলি
ওরে চড়া কমবক্তা,
ছোটবাবু মেরে তোরে
ক'রে দেবে তক্তা। ১০৩

সূত্র-নির্দেশ

১ **সওগাত**, সচিত্র মাসিক পত্র, কলিকাতা, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৬, পৃষ্ঠা : ৩৩১-৩৩৮। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বরিশাল শহরে থাকাকালীন মোতাহেরা 'খেলার সাথী' কবিতাটি রচনা করেন। মালেকা নামে মোতাহেরার এক খালাতো বোন ছিলেন। তাঁরা সমবয়সী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে খুবই ভাব ছিল। এই সময়ে মালেকা বরিশালে মোতাহেরাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন এবং দুই সখী একসঙ্গে দুমাস আনন্দে কাটান। মালেকা চলে যাবার পরে মোতাহেরার মন খুবই খারাপ হয়ে যায়। তখন তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।

২ **মোসলেম-ভারত**, সচিত্র মাসিক পত্র, কলিকাতা, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭, পৃষ্ঠা : ২০০। রচনার স্থান : বরিশাল শহর। পরিবারের এক বিয়োগান্ত ঘটনা অবলম্বন করে 'বাল-বিধবা' কবিতাটি রচিত। মোতাহেরার ছোট ফুপু অল্প বয়সে বিধবা হন। তিনি মোতাহেরার সমবয়সী ছিলেন। এই কবিতাটি তাঁকে কেন্দ্র করেই লেখা।

৩ **মোসলেম-ভারত**, সচিত্র মাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭, পৃষ্ঠা: ২৩৯। রচনার স্থান : বরিশাল শহর।

৪ **মোসলেম-ভারত**, সচিত্র মাসিক পত্র, প্রথমবর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৭, পৃষ্ঠা: ৩৫২-৩৫৩। রচনার স্থান : বরিশাল শহর।

৫ **মোসলেম-ভারত**, সচিত্র মাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৭, পৃষ্ঠা: ৩৮০। রচনার স্থানঃ বরিশাল শহর।

৬ **যুগের আলো**, ত্রৈমাসিক, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৩ পৃষ্ঠা: ১৩-১৪। রচনার স্থান : বরিশাল শহর।

৭ **তরুণ**, আষাঢ়, ১৩৩৩। রচনার স্থান : বরিশাল শহর।

৮ **সওগাত**, মহিলা সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬, আগস্ট, ১৯২৯, পৃষ্ঠা: ২৪। রচনার স্থান : বরিশাল শহর।

৯ **সওগাত**, সচিত্র মাসিক পত্র, ভাদ্র, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা: ৮১২। এই কবিতাটি বরিশাল জেলার নলছিটি গ্রামে ৭ই পৌষ, ১৩৩৭ সনে কবি রচনা করেন।

১০ নলছিটি, ১০ই কার্তিক, ১৩৩৮। নলছিটি গ্রামে থাকাকালীন মোতাহেরা এই কবিতাটি রচনা করেন। কবির স্বামী ইউসুফ আলি তাঁর ডায়েরীতে এই কবিতাটি টুকে রাখেন। কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানি না।

১১ 'মাসিক মোহাম্মদী, কলিকাতা, ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা', আষাঢ়, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা: ৬২৪। এই মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। রচনার স্থান: কলকাতা।

১২ সওগাত, মহিলা সংখ্যা, ২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা: ৭। পার্কসার্কাসের ২৮নং আমির আলি এভিনিউতে থাকাকালীন মোতাহেরা এই কবিতাটি রচনা করেন। তখন তিনি সাত সন্তানের জননী। তাদের নিয়েই এই কবিতাটি রচিত। এই সংখ্যা 'সওগাত' পত্রে কবির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়।

১৩ রচনার স্থান: কলকাতা। এই কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। 'সওগাত' মাসিক পত্রে যখন মোতাহেরার 'শিশু-সপ্তক' প্রকাশিত হয় তখনই তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।

১৪ সওগাত, মহিলা সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০, পৃষ্ঠা: ১৪। রচনার স্থান: কলকাতা। মোতাহেরার প্রথমা কন্যা তাসকিনা বানু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে ছিলেন। তিনি তাঁকে প্রতিদিন দেখতে যেতেন, আর সন্ধ্যার পরে ফিরে আসতেন। কন্যার অবস্থা ভালো না দেখে তিনি বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় একদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে এসে এই কবিতাটিতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন।

১৫ কলকাতা, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৪। অপ্রকাশিত কবিতা।

১৬ সওগাত, মহিলা সংখ্যা ১৩৫২, পৃষ্ঠা: ১৬৮। রচনার স্থান: কলকাতা। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর মোতাহেরা 'হেমন্তিকা' নামে কবিতা রচনা করেন। তখন তিনি কলকাতাতে ছিলেন। পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কবিতাটি পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত করে 'হেমন্ত রজনী' নামে প্রকাশ করেন।

১৭ এই কবিতাটি পার্কসার্কাস থাকাকালীন রচিত। সম্ভবত: ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন। তিনি কবিতাটির কোন নামকরণ করেননি এবং কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

১৮ **বেগম,** মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক, কলিকাতা, ২য় বর্ষ, রবিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬, ২৯ শে মে, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা : ৯। রচনার স্থান : কলকাতা। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের উদ্দেশে এই কবিতাটি রচিত।

১৯ **বেগম,** ঈদ সংখ্যা, ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৩৭৩, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা : ২৪৬। রচনার স্থান : ঢাকা। ঢাকার ধানমণ্ডীর যে বাড়িটিতে মোতাহেরা থাকতেন তা আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত প্রশস্ত দোতলা বাড়ি, সামনে লেক। মশা-মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাড়িটিকে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। খোলা আকাশের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত কবির মনে হত, তিনি যেন এক সোনার খাঁচায় বন্দী।

২০ **বেগম,** মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, ঢাকা, ২০শ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা, রবিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৩৭৪, ১৮ই জুন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা : ৭। রচনার স্থান : ধানমণ্ডী, ঢাকা।

২১ **বেগম,** মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, ঢাকা, ২০শ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, রবিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৭৪, ২রা জুলাই, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা : ৭। রচনার স্থান : ধানমণ্ডী, ঢাকা।

২২ ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ১৯৬৭। চতুর্থ কন্যা শামিমা বানুর শুভ বিবাহ উপলক্ষে মোতাহেরা এই কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতাটি মুদ্রিত করে অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

২৩ ধানমণ্ডী, ঢাকা, ১৯৬৭। অপ্রকাশিত।

২৪ **বেগম,** ঈদ সংখ্যা, ঢাকা, ১৫ই পৌষ, ১৩৭৪, ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা : ১৯২। রচনার স্থান : ঢাকা। এই কবিতায় কবির জীবন দর্শন পরিস্ফুট হয়েছে।

২৫ ঢাকা, অপ্রকাশিত। ২৬ ঐ। ২৭ ঐ। ২৮ ঐ। ২৯ ঐ।

৩০ ঢাকা, ৬ই মার্চ, ১৯৬৮, অপ্রকাশিত। এই কবিতাটি মোতাহেরা কন্যা বুলুর নিকটে লিখিত পত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি লেখেন : "একটা অল্প দামি লেখা পাঠিয়ে হাসাবো তোমাকে।" সাহেবি চালচলন সম্পর্কে কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারই প্রকাশ এই কবিতাটিতে রয়েছে। (দ্র মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ৬ই মার্চ, ১৯৬৮)

৩১ ঢাকা, ১৯৬৮, অপ্রকাশিত। ৩২ ঐ। ৩৩ ঐ। ৩৪ ঐ। ৩৫ ঐ। ৩৬ ঐ। ৩৭ ঐ। ৩৮ ঐ।

৩৯ ঢাকা, ৬ই জুন, ১৯৬৮, অপ্রকাশিত। এই ছড়াটি বাঙাল ভাষায় লিখে মোতাহেরা কন্যা বুলুর নিকটে পত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে লেখেন: "অনেকদিন আগে এই বাঙাল ভাষায় ছড়াটি লিখেছিলাম। পড়ে তুমি হাসবে তাই পাঠালাম। পরে ভালো লেখা দেব।" (দ্র মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ১৬ই জুন, ১৯৬৮)। যেহেতু কবিতাটির রচনার সময় কবি উল্লেখ করেননি, সেজন্য এখানে এই পত্রের সময় উল্লেখ করা হল।

৪০ ঢাকা, অপ্রকাশিত। ঢাকার ধানমণ্ডীর বাড়িতে কি মানসিক অবস্থায় কবি এই কবিতাটি রচনা করেন তা নিজেই লিপিবদ্ধ করে রাখেন: "জালের ভিতর দিয়ে নতুন চাঁদ দেখা যায়, তার সাথে তারাও ঝিকমিক করছে কতকগুলো। কিন্তু এই জালের ছাকনি দিয়ে ছেকে তোলা মুসকিল হয়েছে. তাদের দেখতে এক রকম পাইই না—একদম ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। কি যে করব ভেবে পাই না, এই জাল ঘেরা কেন? একি মায়াজাল না বেড়াজাল বল তো? জান হাফিয়ে ওঠে। মন একটুও টেকে না—কি শাস্তি।

"ওঃ ভাবতে গেলে শিউরে উঠি। মন আমার উড়ে যায় কোন নিরুদ্দেশের পারে। ওই যেখানে সারাদিন রোদে রোদে চিল উড়ে সেখান দিয়ে কোন খানে যাওয়ার পথ। জানিনা ঐ গাং পেরিয়ে, ঐ বন ছাড়িয়ে মন উড়ে চলে যায়, কেমন যেন সারাদিনের জাবর কাটা এক ঘেয়েমি ভালো লাগে না আর। ভাবনার জাল জটা বেঁধেছে, আর ছাড়ান যাচ্ছে না তাকে।

"সারাবেলা রোদ পোড়া রাস্তাটা ধুকছে। আমি ঘরে বসে ধুকছি: কবে যে ছুটি হবে জানিনা।" (দ্র মোতাহেরার নোট)

৪১ ঢাকা, অপ্রকাশিত। ৪২ ঐ। ৪৩ ঐ।

৪৪ বেগম, ঈদ-সংখ্যা, ঢাকা, ৬ই পৌষ, ১৩৭৫, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা: ২০৭।

৪৫ ঢাকা, জুলাই, ১৯৬৯, অপ্রকাশিত। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ. নেইল আরমস্ট্রং চাঁদের বুকে অবতরণ করায় সমগ্র পৃথিবীতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তারপরেই মোতাহেরা এই কবিতাটি রচনা করেন।

৪৬ ঢাকা, ১৩৭৫ সন, অপ্রকাশিত।

৪৭ ঢাকা. অপ্রকাশিত। ৪৮ ঐ। ৪৯ ঐ।

৫০ **বেগম**, ঈদ-সংখ্যা, ঢাকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬, ডিসেম্বর, ১৯৬৯ পৃষ্ঠা : ২৬২।

৫১ ঢাকা, অপ্রকাশিত। ৫২ ঐ। ৫৩ ঐ। ৫৪ ঐ। ৫৫ ঐ। ৫৬ ঐ। ৫৭ ঐ।

৫৮ ঢাকা, অপ্রকাশিত। সুষমা ও লুবনা মোতাহেরার দুই নাতনি। তাদের নিয়ে প্রায় একই সময়ে একই ধরনের কয়েকটি কবিতা তিনি রচনা করেন।

৫৯ **বেগম**, ঈদ-সংখ্যা, ঢাকা, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

৬০ ঢাকা, অপ্রকাশিত। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী মোতাহেরার স্বামী ইউসুফ আলি পরলোক গমন করেন। এমনি এক দিনে এই কবিতাটি রচিত।

৬১ ঢাকা, অপ্রকাশিত। ৬২ ঐ। ৬৩ ঐ। ৬৪ ঐ। ৬৫ ঐ। ৬৬ ঐ। ৬৭ ঐ। ৬৮ ঐ। ৬৯ ঐ। ৭০ ঐ। ৭১ ঐ। ৭২ ঐ। ৭৩ ঐ। ৭৪ ঐ। ৭৫। ঐ। ৭৬ ঐ। ৭৭ ঐ। ৭৮ ঐ। ৭৯ ঐ। ৮০ ঐ। ৮১ ঐ। ৮২ ঐ। ৮৩ ঐ। ৮৪ ঐ। ৮৫ ঐ। ৮৬ ঐ। ৮৭ ঐ। ৮৮ ঐ। ৮৯ ঐ। ৯০ ঐ। ৯১ ঐ। ৯২ ঐ।

৯৩ **বেগম**, মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, ঢাকা, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৮, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ২৩। 'কাফেলা' শব্দের অর্থ হল মরুভূমির যাত্রিদল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোর ছায়া সুস্পষ্টভাবে এই কবিতায় ধরা পড়ে। বাংলার মুক্তিকামী সন্তানদের উদ্দেশে কবি তাঁর অন্তরের স্নেহ ও আশীর্বাদ জানান। কবিতাটির কথা উল্লেখ করে 'দৈনিক বাংলা' লেখে : "বাংলার ভীত ও সন্ত্রস্ত মানুষ এবং তাঁর স্বজনেরাও যখন সীমান্তের ওপারে চলে যেতে থাকে সেই সময় এক বিষণ্ণ বেদনাময় অনুভূতির স্বাক্ষর মূর্ত হয়ে ওঠে এই কবিতাটির প্রতিটি চরনে।" "(দ্র দৈনিক বাংলা, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৭৯)। তখন কবি কন্যা শামিমাকে নিয়ে মেজো কন্যা ছবির বাড়িতে ১২৪ নং নিউইস্কাটন রোডে ছিলেন।

৯৪ ঢাকা, ১৯৭১, অপ্রকাশিত। ৯৫ ঐ। ৯৬ ঐ।

৯৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ঢাকা, অপ্রকাশিত। কবির মৃত্যুর পরে 'দৈনিক বাংলা' কাগজে এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় (দ্র দৈনিক বাংলা, ঢাকা, মঙ্গল-

বার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৭৯, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা : ৬)। বাংলাদেশে
স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের পরেই এই কবিতাটি রচিত হয়।

৯৮ ঢাকা, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭২, অপ্রকাশিত। বাবুয়া ও মুনিয়া কবির নাতি-নাতনি। তারা কলকাতায় থাকে। একটি পত্রে তাদের জন্য এ ছড়াটি লিখে তিনি পাঠিয়ে দেন (দ্র মোতাহেরারপত্র, ঢাকা, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭২)

পরে মার্চমাসে কন্যা বুলুর নিকটে একটি পত্রে তিনি লেখেন : "তাদের যে ছড়াটি লিখে পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা নাম ছুটে গে'ছলো। সেই নামটা জুড়ে দিচ্ছি : 'ইয়াহিয়া টিক্কা নিয়াজি রাও ফরমান' হবে। সবচেয়ে বড় কসাইয়ের নামটাই বাদ পড়েছিল, তাই জুড়ে দিলাম" (দ্র মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ৭ই মার্চ্চ, ১৯৭২)। প্রথমে ছড়াটিতে টিক্কা খানের নাম ছিল না। কবি মার্চ মাসের পত্রের সঙ্গে তা সংযোজন করে পাঠান।

৯৯ তিনি একই সময়ে ছড়াটি একটু পরিবর্তন করে রচনা করেন।

১০০ ঢাকা, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৯, অপ্রকাশিত। কবি তাঁর বিয়ের দিনের কথা মনে করে এই কবিতাটি এক টুকুরা কাগজে পেন্সিল দিয়ে লেখেন।

১০১ বেগম, ঈদ্-সংখ্যা, ঢাকা, ১৯শে কার্তিক, ১৩৭৯, ৫ই নভেম্বর, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩৪।

১০২ ঢাকা, ১৩৭৯, অপ্রকাশিত

১০৩ কবির সর্বশেষ রচনা তাঁর মৃত্যুর পরে ওষুধের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। পেন্সিল দিয়ে লেখা দুটো কাগজে দুবার একটু পরিবর্তন করে তিনি কবিতাটি লেখেন। তিনি কোন্ অংশটুকু আগে ও কোন্ অংশটুকু পরে লেখেন তা বোঝা যায় না। কবিতাটির কোনই নামকরণ তিনি করেননি। মনে হয়, ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে তিনি এই কবিতা লেখেন। তখন তিনি ১২৪নং নিউ ইস্কাটন রোড়ের বাড়িতে শয্যাশায়ী। এই সময়ে তাঁর ঘরে চড়ুই পাখির যে আনাগোনা হত, তা তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই তিনি এই কবিতায় ধরে রাখেন। সুতরাং কোন পরিবর্তন না করে এই দুটো রচনাই এখানে প্রকাশ করা হল।

পরিশিষ্ট 'ক'

মোতাহেরা বানুর নিকটে লিখিত মোহিনী সেনগুপ্তার পত্রাবলী

(১)

26/2, Bahir-Mirzapur Road,
P. O. Amherst Street,
Calcutta, 17, 5. 20.

সহৃদয়াসু—

আপনার সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই; ঠিকানাও খুঁজে পেলুম না। কাজেই "সওগাত" আপিসের কেয়ারে লিখ্‌চি—চিঠিখানা পাবেন কি না জানি না। যদি পান, অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটা দিলে বাধিতা হব।

গত চৈত্র সংখ্যার "সওগাতে" আপনার রচীত, "খেলার সাথী" শীর্ষক কবিতাটি পড়ে, ভারি খুসী হয়েচি। আমি গান নিয়ে বড়ই খেপে থাকি; বোধ হয় বিস্তর মাসিক পত্রিকাতে আমার কৃত স্বরলিপি দেখে, তা টের পেয়েছেন। ২/৩ খানি মুসলমান সম্প্রদায়ের মাসিক পত্রিকার আপিস থেকে, নূতন নূতন গান, স্বরলিপি সহ, প্রকাশার্থ পাঠাতে, আমার কাছে অনুরোধ পত্র এসেছে। মুসলমান ধর্মের গান আমার জানা নেই; আর আমি ইচ্ছা করি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাগচে, মুসলমান ধর্মেরই গান—স্বরলিপিসহ প্রকাশ করি। আপনি সুলেখিকা; কবিতা লেখার আপনার বেশ দক্ষতা আছে, আপনার 'খেলার সাথী' কবিতাটি পড়ে তা বুঝলাম! আপনি কি আমার কিছু সাহায্য করতে পারেন? মনে করলেই পারেন। ভরসা করি আমাকে সাহায্য দানের কথাটুকুকে আপনার মনের একটি নিভৃত কোনে স্থান দিতে পারবেন।

সাহায্য এই আপনার কাছ থেকে চাই, যে আপনি আপনার অবসর মত, মাঝে মাঝে নূতন নূতন গান রচনা করে আমার কাছে পাঠান। আমি সে গুলিতে উপযুক্ত সুর তাল দিয়ে, আর সে গুলির স্বরলিপি করে, মুসলমান মাসিক সাহিত্যে প্রকাশ করব। গানগুলি মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধীয় ঈশ্বর সঙ্গীত হওয়া চাই। কিন্তু আধুনিক মার্জিত ও সভ্য বাঙলা ভাষাতে,

উচ্চাঙ্গের কবিত্বপূর্ণ এবং সুরুচিপূর্ণ ভাবে লিখিত। মানে, সেগুলিতে গোঁড়ামি গোছ ভাব না থাকে এবং অপর ধর্মগুলির প্রতি কোন রকম ভালমন্দ ইঙ্গিত না থাকে। আর গানগুলি এমনভাবে লিখিত হলে ভাল হয়, যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় লৌকিক রস-সঙ্গীত, কিন্তু সামান্য একটু চেষ্টা করে বুঝলে, স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেগুলি পারমার্থিক (ঈশ্বর) সঙ্গীত। ভীষণ বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলে, গানের পক্ষে সুবিধা হয় না। ছোট ছোট, সরল, সহজ শব্দগুলি থাকা চাই, অথচ তারই মধ্যে কবিত্ব ও ভাব উচ্চাঙ্গের হওয়া চাই। যেমন ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গানগুলি। লম্বা লম্বা গান হলে, গানের পক্ষে ভারি অসুবিধা হয়। অতএব যাতে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ, এই চারটি বিভাগ থাকে, সেই গানই সুবিধাজনক। বেশি নয়।

দয়া করে মনে রাখলে অনুগৃহিতা হব যে যে গানগুলি রচনা করে আমার কাছে পাঠাবেন, সেগুলি যেন আপনি কোনো মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশার্থ সোজা না পাঠান। কেবল আমিই সেগুলিকে স্বরলিপিসহ প্রকাশ করবো। আপনি প্রকাশ করবেন না। অবশ্য আপনার রচিত বলে, আপনার নাম স্বরলিপির ওপরে প্রকাশিত থাকবে। আর যদি আপনি কোনো গান রচনা করে, প্রকাশ করে থাকেন, সে গান আমার কাছে পাঠাবেন না। কেবল অপ্রকাশিত গানই পাঠাবেন।

প্রার্থনা করি আপনি সাহিত্য সেবা মন্দিরে চিরাধিষ্টিতা হয়ে থাকুন আর আপনার আমার মধ্যে বর্তমান অশরীরী পরিচয় নিবিড়তর হক।

মনে কিছু করবেন না। কষ্ট দিচ্ছি। আপনি আমার বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। ইতি—

বিনম্রাবনতা—
মোহিনী সেনগুপ্তা।

(২)

26/2, Bahir-Mirzapur Road,
P, O. Amherst street
Calcutta, 26. 5. 20

সহৃদয়া বন্ধু—

আমি জানিতাম না যে আপনি "ফ্লোরা-হাউসে"র ফ্লাওয়ার! তাই

বুঝি আপনার কবিতাগুলি ফুলে ফুলে পোরা? দিল্-খুশ্ গন্ধে চতুর্দিক মাত্ওয়ারা করিয়া তুলিতেছে? স্বাগতম্ বন্ধু! মহৎ-চেতা বন্ধুর মহত্ব নিদর্শন স্বরূপ পত্রখানি আমার পক্ষে যে অভাবনীয় আনন্দের জিনিস! আপনার "বরিশাল গান" ভক্তদের প্রাণে বিমল আনন্দের অনুভূতি আসুক, যাহা তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম ভাবের বিকাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের পথে আরও পরিচালিত করিতে পারে!

আপনি সুলেখিকা বা সুকবী বলিয়া নিজেকে পরিচিতা করিতে চাহেন না; অবশ্য ওটী স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার কবিতাগুলি যে সে সম্বন্ধে আপনার পরিচয় দিতেছে; আপনার পত্রখানি যে সে সম্বন্ধে কি সুন্দর পরিচয় দিতেছে!

বোধ হয় আপনি বুঝিয়া থাকিবেন যে আমার প্রথম পত্রে আমি এমন কিছু বলি নাই যে আপনি আপনার কবিতার জন্য কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দিন। আপনার কবিতা যেরূপ চলিতেছে—চলুক। আমি কেবল ইহাই আশা করি যে মাঝে মাঝে দুই-একটী করিয়া গানের ধরনে, গানের যোগ্য, নূতন নূতন রচিত কবিতা আমি যেন আপনার কাছ হইতে পাইতে পারি। আপনি সে আশাবাণী দিয়াছেন বুঝিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

সাংসারিক কাজকর্মের কথা আর তুলিবেন না! দেখিতেছি, আমাকেও যেমন ভীষণতর ব্যস্ত থাকিতে হয়, আপনাকেও তদ্রুপ। অপর কিছু করিতে সংসারীর বড়ই সময়াভাব। আমি তাহা খুব বুঝি, কারণ ভুক্তভোগী! কিন্তু সংসারের কাজে অহরহ ঘোর সংগ্রাম করা সত্বেও, আমি দৈনিক এক ঘণ্টাকাল সঙ্গীতের জন্য দিয়া থাকি। আপনিও যদি ঐ রকম একটা "রুটীন" একবারটি ধরিতে পারেন, তবে 'রুটীন' -ভ্যাস হইয়া যাওয়া বশতঃ, কবিতালক্ষ্মীর পূজা করিবার জন্য, আপনার সময়ের অভাবটুকু ক্রমে কতকটা ঘুচিয়া যাইতে পারে।

আপনি কি নব প্রকাশিত 'মুস্লিম-ভারত'' এক কাপি পাইয়াছেন? আমি, এক কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়া দিবার জন্য বলিয়া দিয়াছি।

আপনি এ অযোগ্য বন্ধুর অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনাপূর্ণ প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনার একনিষ্ঠ সাধনার জয় হউক; ভগবান আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন! আশা করি আপনার শারীরিক ও পারিবারিক সমস্ত মঙ্গল। কুশল দানে সুখী করিবেন। ইতি—

বিনীতা—

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

(৩)

26/2, Bhair-Mirzapur Road,
P. O. Amherst Street,
Calcutta, 15. 10, 20

প্রীতিভাজনাসু—

ভগ্নি! আপনি মাত্র একখানি চিটী লিখে—সুখী করে, আর কেন চিটী না লিখে—আমাকে আপনার স্নেহ-মমতা হতে বঞ্চিতা করে রাখলেন? সম্ভব, সাংসারিক কাজে ব্যস্ততার দরুণ, এ অধীনা ছোট বোন্‌টিকে মনে আনবার ফুর্‌সত পান নাই। যাক্ সে শিকায়তু-অভিযোগের কথা! ভাদ্র সংখ্যার "মোসলেম ভারতে" আপনার রচিত "অধীরা" শীর্ষক কবিতাটি পড়ে আমি যে আর স্থির থাক্‌তে পারলুম না! কবিতাটিকে গানে আন্‌তে যে আমার ভারি লোভ্ হয়েছে! এখন আপনিই আমার সে লোভটার চিকিৎসা-কারিণী! কবিতাটিকে আমি কোনোগতিকে গানে পরিণত করেছি; কিন্তু আপনি জানেন আমি কবি নহি! তাই আমার ভয়, আমি "অধীরা" বিষয়টির অবমাননা, গানে আন্‌তে গিয়ে, করে ত ফেলি নাই! তাই আমার চিন্তা, আপনার প্রাণের বক্তব্যটিকে ত, গানে আন্‌তে গিয়ে, অসম্পূর্ণ আকারে ত ছেড়ে দিই নাই!

আপনি কি দয়া করে, গানটিকে, একটু কষ্ট করে, সংশোধন করে এবং ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করে, আমার কাছে শীঘ্র পাঠাতে পারেন না? ভরসা করি এটুকু উপকার করতে পারবেন। আমি গানটিতে সুর তাল সংযোযন করে, এবং স্বরলিপি করে, "ভারতবর্ষে" প্রকাশ করব মনে করে আছি। আশা করি আমার সে আশা, আপনার সাহায্যে, কার্যে পরিণত হতে পারবে।

আপনি আমার বিস্তর ২ আদাব্ গ্রহণ করুন। ভরসা করি মঙ্গলময়ের কৃপায় আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। ইতি—

আমি এ গানটির নকল রাখি নাই।

বিনীতা ভগ্নি—
শ্রী মোহিনী সেনগুপ্তা

এই পত্রের মধ্যে শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা "অধীরা" 'কবিতাটির যে স্বরলিপি করেন তা উদ্ধৃত করা হল :

আস্থায়ী।

তুমি কর-গো আমায় বধির তোমার
অধীর বাঁশরী বাজায়ে,—
এস হৃদি-কদম্বে শিহরণ তুলি'
হিয়ার যমুনা নাচায়ে।

আস্থায়ী **অন্তরা** গাহিতে হয়।

অন্তরা।

ধেনুগণ গোঠে নাহি আসে আর,
বাজে না ত বেণু এখানে;
বহে না উজান বাঁশের বাঁশীর
বাজে নাক তান সে-কানে!
আকুল কর গো ব্যাকুল কর গো
বাঁশের বাঁশরী বাজায়ে
আর কোন দিকে যেন যাইতে না পারি
তারি মায়াতান ছাড়ায়ে!

অন্তরা গাহিয়া আবার **আস্থায়ী** গাহিতে হয়

সঞ্চারী।

লজ্জা শরম ভরম ধরম
বঁধু নাহি চাই চাই হে—
তোমাতে মজিতে তোমারি হইতে,
শুধু তোমাতে ছুটিতে ধাই হে,—

সঞ্চারী গাহিয়া, **আস্থায়ী** গাওয়া চলে না। সঞ্চারী গাওয়া শেষ করিয়া **আভোগ** ধরিতে হয়।

আভোগ।

ভাল বাসিতে জানে না হৃদয় আমার,
তুমি সুঁদর নাগর প্রীতির আগার;
মম উষর হৃদি কর গো সুসার,
ঢালিয়া প্রণয় শত শত ধার,
রাজাহে ভূষণ আমার হরে নিয়ে যাও
তোমারে বসনে সাজায়ে—
এস হৃদি-কদম্বে শিহরণ তুলি'—
হিয়ার যমুনা নাচায়ে!

আভোগ গাহিয়া **আস্থায়ীতে** যাইতে হয়। **আস্থায়ীতে** গিয়া, উহা গাহিয়া, তখন গান গাওয়া শেষ হয়।

(৪)

২৬/২, বাহির-মির্জ্জাপুর রোড।
পোঃ আঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
কলিকাতা, ২০.১০.২০ ইং

সহৃদয়া-ভগ্নি!

ভাই, তোমার চিঠীখানি পেয়ে বাস্তবিক প্রাণে বড়ই আঘাত পেলাম।

কিন্তু তুমি আমি পারি কি করতে, ভাই! সকলই যে বিধাতার কাজ! "লা-এলাহা-ইল্লাল্লাহ", তাঁরই উপাসনা কর ভাই! তিনিই তোমাদের প্রাণে-মনে শান্তিধারা ছড়িয়ে দেবেন। ভাই, ফুল্ল মনে এখন তুমি আর তোমার স্বামী (আমার ভগ্নি-পতি-সাহেব) প্রীতিভরে এ ওর পানে চেয়ে থাক, আর উভয়ে মস্জিদের দিকে নিয়মিত যেতে ভুলো না ; দেখ্‌বে, অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রাণ-মন্ সরসা হরষা হয়ে উঠ্‌বে!

কবিতা লেখা খতম্ করার কথাকে মনের কোনেও স্থান দিওনা ভাই! গন্ধ, বরণ, ছন্দ নিয়ে, সুরের লীলাতে নিশ্চয় মেতে থাকবে! দেখবে, সে সুর , তোমাদের হৃদয়ে, কি চমৎকার রস বহাবে। হোক্ না হাজার সংসারের ভার, তোমার স্কন্ধে!

আমি তোমার "অধীরা" গানটিরই যে শুধু স্বরলিপি করব তাই নয়। তোমার "প্রতীক্ষায়" শীর্ষক কবিতাটিকেও গানে এনে, স্বরলিপি করেছি। এ দুটিরই স্বরলিপি আমার "স্বর মূর্চ্ছনা" পুস্তকে দিলাম। বই খানা ছাপা শেষ হলেই তোমাকে এক কাপি উপহার পাঠাব।

তুমি আমাকে দিদি বলেছ, ঠিক্ বলেছ। তুমি ১৭ বৎসরের, আর আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ১৭ বৎসরের। তুমি তার, আজ হতে মাসিমা হলে। তাই তোমাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করলাম।

তুমি কলিকাতায় আসবে শুনে মনে একটা আশা হচ্চে যে তোমাতে আমাতে মিশে একবারটি কেঁদে, বৃদ্ধা মাতামহীর আত্মার শান্তির জন্য আরাধনা করব।*

তুমি আমার স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা গ্রহণ করো। মঙ্গলময় তোমাদের শান্তি আনয়ন করুন। আমেন।

আশীর্ব্বাদিকা—

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা

[*এই পত্রে যে বৃদ্ধা মাতামহীর কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের মাতা সৈয়দুন্নেসা। বিবাহের পরে মোতাহেরা তাঁর স্বামীর সঙ্গে বরিশাল শহরে ফজলুল হকের বাড়িতে তাঁর মাতার সঙ্গে থাকেন। মোতাহেরা এখানে সৈয়দুন্নেসার সঙ্গে এক বৎসর পাঁচ মাস কাটান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দুন্নেসা পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর কাছে মোতাহেরা ও তাঁর স্বামী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মোতাহেরা গভীর বেদনা অনুভব করেন।]

পরিশিষ্ট—'খ'

নজরুল কী রোগে ভুগছিলেন?

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট রবিবার সকাল ১০ টা ১০ মিনিট-এ বাংলাদেশের ঢাকার পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কলকাতায় কবির সরকারী চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্র কুমার রায়। তিনি কবির রোগ সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেন তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর পত্র থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। ডাঃ দ্বিজেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন: "… কবির রোগের কারণ সম্বন্ধে আমি বহু দিন ধরে বহু রকম শুনে আসছি। সবচেয়ে যে-ধারনাটি সাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল সেটি হচ্ছে বোধ হয়, জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাজনিত একটি বিশেষ রোগে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি ১৯৬৫ সাল থেকে কবির চিকিৎসা করে আসছি এবং ১৯৬৯ সালে সরকারী ভাবে কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হই। কবির চিকিৎসা করতে এসে, কবিকে ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলাম, তাঁর একটি বিশেষ রোগে ভোগার জনশ্রুতি সম্পূর্ণ ভুল। আমি দিনের পর দিন নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে পারলাম, এই অসাধারণ কবির রোগও অসাধারণ। একটি বিশেষ রোগের যা লক্ষণ—পা দুটি দুর্বল হয়ে যাওয়া—তা কবির ছিল না। তিনি চমৎকার হেঁটে বেড়াতেন এবং এ-ঘর থেকে ওঘরে ভালোভাবেই যাতায়াত করতেন। কবির ব্রেণে কোনও জার্ম বা রক্তে এই বিশেষ রোগের কোনও লক্ষণ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে মৃগীতে আক্রান্ত হতেন, এবং মাঝে মাঝে রক্তচাপ বেশ বৃদ্ধি পেত। আবার সঠিক চিকিৎসায় সব কিছুই নিরাময় হত।

"তবে কী রোগে কবি ভুগেছেন এই প্রশ্ন জনসাধারণের মনে স্বভাবতই জাগে। তিনি যে-রোগে ভুগেছেন, সেই রোগটির নাম প্রি-সেনাইল ডিমেনসিয়া। সেনাইল কথার অর্থ বার্ধক্য। প্রৌঢ় অবস্থায় এই বিশেষ রোগটির সূত্রপাত হয় বলে এটিকে প্রি-সেনাইল ডিজইস্ বলা হয়।

"এই রোগে ব্রেনের সামনের অংশটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং

রোগীর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। এ-রোগের উৎপত্তির কারন আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। আমি দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করেছি। দুজন বিখ্যাত চিকিৎসক প্রথমে এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ করেন। তাঁদের নাম: ডাঃ পিকস্ এবং ডাঃ অ্যালজেমার। পিকস্ ডিজইস্ এবং অ্যালজেমা ডিজইস্-এর মধ্যে পার্থক্য করতে গেলে ব্রেন বায়োপসির দরকার। সেটাই কবির ক্ষেত্রে করানো সম্ভব হয়নি। কেবল-মাত্র ব্রেন টিউমার আছে কিনা দেখবার জন্য লণ্ডন হাসপাতালে ভেনটি-ক্যুলোগ্রাম করা হয়। এরার এনসেফ্যালোগ্রাফি করে দেখা হয়েছিল যে. কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ বা ফ্রনটাল লোব দুটি সংকুচিত হয়ে গেছে। কোনও টিউমার ব্রেনে ছিল না। তবে স্যামসিকস্ অপারেশনের বিরুদ্ধে সে সময়ে অনেকেই রায় দেন, আমিও দিয়েছিলাম। তাঁর মস্তিষ্কে শেষ পর্যন্ত এই অপারেশন করা হয়নি।'

[ডাঃ দ্বিজেন্দ্র কুমার রায়, কবি নজরুলের সরকারী চিকিৎসক, কলিকাতা-১৪, 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগ, 'নজরুল কী রোগে ভুগছিলেন?', আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার ৮ই আশ্বিন, ১৩৮৩, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা: ৪]

পরিশিষ্ট—'গ'

মোতাহেরা বানুর পত্রাবলী থেকে উদ্ধৃত অংশ:

কন্যা বুলুর নিকটে একটি পত্রে মোতাহেরা লেখেন:

"মা, আমার লেখাত লোককে দেখাবার মত নয়, নিতান্ত তুচ্ছ জিনিষ। শুধু তুমি খুসি হবে তাই পাঠানো। লেখা ভালো হয় না তাই বেশি লিখিনা। তুমি আমার গত জীবনের যে ছবি দেখছ তার থেকে আমি অনেক দূরে বহু বহু যোজন দূরে স'রে গেছি।

"ওটা যেন রাজা মান্ধাতার পূর্ব্বজন্মের গল্প। রাজা মান্ধাতা তাঁর পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির পুণ্যের ফলে স্বর্গবাসী হয়েছেন, আর রাণী মা তার কোন অজ্ঞাত দুষ্কৃতির ফলে পেত্নী হয়ে শিংশপা গাছের ডালে বসে নাকি সুরে কাঁদছে আর পথ চলা পথিককে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

"কোনো কালে তার ঘর ছিল না, সংসার ছিল না। কিছু মনে পড়ছে না, শুধু একটা বড় রকমের অগ্নি কাণ্ডের কথা মনে হয় মাঝে মাঝে।

এ ঘরে কখনো আনন্দ উৎসব হয়নি, শিশুরা হাসেনি। এ শূন্য মরু বালুকণা শুধু রৌদ্রদাহে ঝলকায়, নিজেও পোড়ে, অপরকেও পোড়ায়। কোনো স্বপ্ন নেই অতীত নেই বর্ত্তমান নেই ভবিষ্যৎও নেই।

"তবু, তবু ঐ আঁধারের রাজত্বেই সুন্দর একটি আলোর বৃত্ত রচনা করে তাতেই বাস করছি আমি। আমি কিছুতেই হারছি না, হার মানছি না। আমি প্রাণ খুলে হাসছি, সবারে ভাল বাসছি। বেঁচে আছি এটাই তো পরম লাভ। তোমরা আছ, আমার ভয়টা কি"।

পুনশ্চ—

"এখানে নিম্নচাপের মেহেরবানিতে ঝড় তুফান প্রবল বৃষ্টিপাত সয়লাব লেগেই আছে। মনে হয় আর কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে আমরা সব বে অব বেঙ্গলের উদরস্থ হয়ে যাব। যাহাঁ পতেঙ্গা হাওয়া অফিস ঘোষণা করলো নিম্নচাপ কিংবা লঘুচাপ। বাস্ আর রক্ষা নেই, অমনি মাতামাতি শুরু হয়ে গেল'। আর তুমি ঘর থেকে বেরুতে পারবে না, অফিস আদালত শিকেয় ঝুললো। ভিজে কাক হয়ে সবাই হাটুপানি ঠেলে পথ চলতে শুরু করলো। আমার কিন্তু ভালোই লাগে সারা দিনমান কল কল ছল ছল অবিরাম বর্ষণ আর বর্ষণ।

"সূর্য্যের মুখ ঢেকে দিয়েছে নীল কালো আর ধোঁয়া মেঘেরা। তোমাকে মনে করছি, আর ছবির বাড়ীতে বসে ইলিস মাছ ভাজা আর খিচুড়ি খাচ্ছি। কালোজিরের ফোঁড়ন দিয়ে ইলিস মাছের মাথা আর কচু শাকের ঘণ্ট খাচ্ছি। এই সব নিয়ে ভালোই কাটছে দিনগুলো"।

[মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ১৬ই জুন, ১৯৬৮]

মোতাহেরা কন্যা বুলুকে একটি পত্রে লিখেছেন: "কাল থেকে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। মাঠ-ঘাট জলে জলময় হয়ে গেছে। যতদূরে তাকাও শুধু পানির সয়লাব। আর জলে ডোবা গাছ গাছালির সবুজ শরীর, আকাশটা ঘোলাটে রং ধরেছে। বুড়ি গঙ্গা যেন পায়ে পায়ে বেড়াতে এসেছে সমস্ত ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসটা জুড়ে। সন্ধ্যার আগেই ঘোর হয়ে আসছে।

"একটু পরেই ব্যাংয়েরা গান ধরবে। যারা বাইরে যাবে তাদের কষ্ট আমার কোনো কাজ নেই তাই কোনো অসুবিধাও নেই। এই বারান্দা থেকে দেখা,' জানলা থেকে দেখা ভরা বরষার রূপটা ভালোই লাগছে। আমি

যেন ভেসে চলেছি কোন নিরুদ্দেশের পথে। তোমরা চার বোন যেন আমার মায়ের চারটি অংশ। আমার মা যেন তোমাদের মুখ দিয়ে কথা বলছেন আমার সাথে। তোমাদের মায়াভরা মন দিয়ে আদর করছেন ভালোবাসছেন আমাকে। আমিও সকল মায়া সবকুটু স্নেহ ভালোবাসা তোমাদের জন্যই ঢেলে দিলাম।"

একই পত্রে মোতাহেরা তাঁর জামাতা রাজ্জাক (ডাঃ সি. এম. এ. রাজ্জাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার) সম্পর্কে লেখেন: রাজ্জাক বেশী কথা বলে না এমনিতে, থেকে থেকে একটু একটু ক'রে একেক চুপা ছাড়ে। তাই থেকে আন্দাজ করে নিই তোমার মণিরা কেমন আছে"।

[মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ১২ই জুলাই, ১৯২০। এই পত্র লেখার সময়ে মোতাহেরা পঞ্চম কন্যা মিনুর (তাছনিম বানু) নিকটে ঢাকা বিশ্ববিদ্য'-লয়ের কোয়ার্টাসে ছিলেন। মোতাহেরার প্রথমা কন্যা তাসকিনার অকালে মৃত্যু হয়। এখানে তাই তিনি চার কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন।]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা উল্লেখ করে কন্যা বুলুকে মোতাহারা একটি পোস্ট কার্ডে লেখেন :

"....কি দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে দিনগুলো কেটেছে আমাদের তা লেখা যায় না। কি যে ভীষণ লড়াই হ'ল মা' যে শুনলে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। এখন বেশী কিছু লিখব না। পরে জানাব সব। চোখের সামনে অনেক নয়া ইতিহাস লেখা হচ্ছে, অনেক লেখা মুছে যাচ্ছে। দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তর অবলোকন করছি। ....বাবু মুনির সাথে দেখা হ'লে অনেক অনেক গল্প ব'লবো তাদের কাছে যেমন গল্প কক্ষণো শোনেনি ওরা।"

[মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯২২]

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের পরে কন্যা বুলুর নিকটে এক পত্রে মোতাহেরা লেখেন :

"মা আমার সোনামণি মা, তোমার চিঠি প'ড়ে প্রাণ জুড়াল আমার। কি বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই পুরো ন'টা মাস কেটে গেল তা লিখবার ভাষা নেই। গোলাগুলির কান ফাটা আওয়াজে রাতের ঘুম দিনের স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। দুর্ভাবনায় আতঙ্কে সবাই আধমরা হয়েছিলাম। সে কি অবস্থা।

"আর প্রতিনিয়ত দুঃসংবাদ শুনে শুনে একেবারে পাথর হ'য়ে গিয়েছিলাম।

আর কি লিখব। সব কাতলে আম কাৎলে খাসের খবর তো তোমরা শুনেই ছ, আরো কত শুনতে পাবে। শয়তানরা আবার অফিস স্কুল সব খোলা রেখেছিল এই উথাল পাথালের মধ্যেই। রমজানেও ছুটি ছিল না এবার। এর মধ্যেই ছবিকে স্কুল করতে হয়েছে।

"স্কুলে বোমা প'ড়েছে ছবির সামনেই। জান হাতে ক'রে সবাইকে বাইরে বেরুতে হ'তো। না বেরিয়ে উপায় ছিল না। জাকারিয়াকে অনেক ভয়ে ভয়ে কাজ করতে হোত। ওর অফিসে সশস্ত্র খান সেনারা গিস গিস ক'রত। জাকারিয়া টুনু ছবি বাইরে গেলে আমার কলজে শুকিয়ে যেত, ব'সে ব'সে আল্লাকে ডাকতাম, আর 'কালাম' পাক পড়ে দোওয়া চাইতাম ওরা যেন সহি সালামতে ঘরে ফিরে আসে। এই ভাবে দিন কেটেছে। তোমরা দূরে যে দু'জন ছিলে (মানে মিনু ও তুমি), তোমাদের দুজনকেও দোওয়া ক'রেছি। কিন্তু তোমাদের দিক থেকে আমি নির্ভয়ে ছিলাম, ঠাণ্ডা ছিলাম। যারা কাছে ছিল তাদের নিয়েই যত যন্ত্রণা, যত ভয় ভাবনায় কাঁটা হ'য়ে ছিলাম। এখন সেই শ্বাসরোধি অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। বুক ভ'রে শ্বাস নিলাম, আবার বাঁচলাম।

"তোমার মুনি তোমার বাবুকে দোওয়া দিলাম, ভালোবাসা দিলাম, চুমু দিলাম, এ ঘরের ইঁদুর ওঘরে যায়, ছালা কাইট্টা কলাই খায়, বেড়াল এল মাউ মাউ ইত্যাদি। তোমাদের সাথে যদি কখনো দেখা হয় অনেক কথা বলব এবং শুনব। আজ তোমাদের সবাইকে আদর ক'রে ইতি করছি।"

[মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯২২]

কন্যা বুলুকে একটি পত্রে মোতাহেরা লেখেন :

"ছবির মুরগীর আটটা বাচ্চা হয়েছে। তারা খুব ঝামেলা করে। অনেক তরকারি লাগিয়েছিলাম। কিছুই হয়নি। মাটি ভালো না। এ মাটি শুধু গোলাপের, আর গন্ধরাজের, আর হাস্নাহেনার। একটা নারকেল গাছ আছে তাতে কিছুটা ফল ধরেছে। আম গাছে বোল এসেছে অল্প কিছু। তোমাদের আশে পাশে ঘুরে ফিরে আসে মনটা।"

[মোতাহেরের পত্র ঢাকা, ৭ই মার্চ, ১৯২২]

কন্যা বুলুকে একটি পত্রে মোতাহেরা লেখেন :

'...কেন জানিনা মোটেই লিখতে ইচ্ছে করে না, চুপচাপ বসে থাকি।

এই তো কিছুদিন আগেই তোমরা এসেছিলে, কয়েকটা দিন ছিলেও। তবুও মনটা খালি হ'য়ে গেছে, সেই ছোট ঘরটার দিকে তাকাতে পারছি না। এখানে প্রায় দিন বিশেক প্রচণ্ড খরা গেছে। এখন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ'চ্ছে, তবে একটানা নয়, রোদেও তেমন একটা প্রখরতা নেই। সকাল বিকেলের সূর্য্য ঢাকা পড়ে থাকে মেঘের ঘোমটায়।

"বিষ্টি যখন ঝামুর ঝুমুর নামতে থাকে তখন মুনিয়াকে মনে পড়ে। আর আকাশের কালো মেঘে মনে হয় বাবুয়া চেয়ে আছে। ব্যাং এর ডাকের জন্য ভাবতে হবে না তোমার। তাঁরা আর নেই এ পাড়ায়, কোথায় যেন হিজরত করেছে ওরা। এখন পানি হ'লে কোনো ব্যাং-এরই ডাক শোনা যায় না।

"···দ'য়েল শিস দিচ্ছে. টুনটুনীরা টুন টুন করে নাচছে, একটা হলদে পাখী সজনে গাছের ডালে বসলো এসে। শশা গাছটা ম'রে গেছে অল্প কয়েকটা শশা দিয়েই। কুমড়া গাছটা ভালো আছে। মুরগী হাঁসরাও ভালো আছে।

"···লেখার যেন কিছুই নেই, মনটা একেবারে অনুপস্থিত, কোথাও যে চলে যাই কিছুই বুঝতে পারি না।"

[মোতাহেরার পত্র, ঢাকা, ২০শে জুলাই, ১৯২২]

পরিশিষ্ট 'ঘ'

॥ জীবন যে রকম ॥

১৯৭১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি। ঘর খালি করে ওপারে চলে যাচ্ছে বাংলার দামাল ছেলেরা। চারিদিকে নিঃশব্দ এক বিদায়ের আয়োজন। ঢাকার রাস্তাঘাটে বাঙ্গালী তরুণ যুবকদের তেমন দেখতেই পাওয়া যায় না। রাতের গোপন অন্ধকারে ওরা যাত্রা করে সীমান্তের দিকে। বাংলার তারকা-খচিত উজ্জ্বল আকাশের দিকে হয়ত চোখ যায় তাদের। দামাল ছেলেদের কারো হয়ত মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাসের কবিতা: আবার আসি ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। হয়ত মানুষ হয়ে নয় শংখচিল শালিকের বেশে।

তখনকার দিনগুলির এই বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল বেদনার স্পর্শ পাওয়া যায়

এক বর্ষীয়সী মহিলা কবির কবিতায়। বাংলার দামাল ছেলেদের নিঃশব্দ বিদায়ের আয়োজন তাঁকে দিয়েছিল গভীর দুঃখ। ঠিক সে সময়েই 'বিদায়ী কাফেলা' নামে একটি কবিতা তিনি লেখেন যার ভেতর প্রকাশের কোন আর্তিই এতটুকু অল্প নয়।

তোমাদের প্রতীক্ষায় কেটে যাবে
কত যুগ কত বর্ষ মাস
হয়ত ফুরাবে এই
বাঁচিবার নিষ্ফল প্রয়াস।
আর যদি কোনোদিন
তোমাদের দেখা নাহি পাই
ধরণীর ধূলি মাঝে
মিশে যদি ধুলো হয়ে যাই
তবু তোমাদের পথে
জ্বেলে যাব কল্যাণ দীপিকা
লিখে যাব দীপ্তভালে
অজেয় প্রাণের জয়টীকা।

বর্ষীয়সী এই মহিলা কবির নাম বেগম সৈয়দা মোতাহেরা বানু। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার পর বয়সের দিক দিয়ে ইনিই সম্ভবত বাংলাদেশের প্রবীনতম মহিলা কবি। ঢাকায় খুব এক নির্জন আলয়ে বসবাস করছেন তিনি। কবিতা লেখার প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, 'আমি আজকাল লেখা ছেড়েই দিয়েছি'। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এবং নামকরা মহিলা পত্র-পত্রিকাগুলি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সময় এই প্রবীণা মহিলা কবির একটি বা দুটি কবিতা ছাপাতে কখনো ভোলে না।

বিশেষভাবে দুজন যুগ-ধন্য ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন বেগম সৈয়দা মোতাহেরা বানু। একজন তাঁর আপন মামাশ্বশুর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, দ্বিতীয় জন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাছাড়া তখনকার দিনে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন—তাঁদের ভেতর গায়িকা মোহিনী সেনগুপ্তা এবং গায়ক কে. মল্লিকের কথা উল্লেখ করলেন। কবি বেগম সুফিয়া কামালও সে সময়ে তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। আপা বলে ডাকতেন। গায়িকা মোহিনী সেনগুপ্তা বেগম সৈয়দা মোতাহেরা বানুর কিছু সংখ্যক গানের স্বরলিপি করেছিলেন। সে আমলের বিখ্যাত জনপ্রিয় গায়ক কে. মল্লিক তাঁর লেখা গানের রেকর্ড করেছিলেন। একটি গানের প্রথম লাইনটি তাঁর মনে আছে। খুব সুন্দর কথা।

'তুমি কর গো আমায় বধির, তোমার
অধীর বাঁশরী বাজায়ে.. ।'

আমি তাঁর কবিতার কথা জিজ্ঞেস করলে বারবার তিনি ঐ কথাই বললেন, আমার আজকাল লেখাটেখা হয়ে ওঠে না। কবি কেন এ কথাটা বারবার বলেন এটা পরে বুঝেছি! যাহাকে কাজী নজরুল ইসলামের গল্প করতে যেয়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন বেগম সৈয়দা মোতাহেরা বানু। বিদ্রোহী কবি প্রায়ই আসতেন তাঁদের বাসায়। যখনকার কথা বলছেন, তখন নজরুলের বয়স তিরিশ পার হয়ে গেছে। ১৯৩১ কি ১৯৩২ সনের কথা। প্রথক দিকে পর্দার আড়ালে থেকে কথাবার্তা হত। পরে তাঁর স্বামী খান বাহাদুর আবু নাসের ইউসুফ আলী (যিনি বিদ্রোহী কবির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন) এই পর্দা নিয়ে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে আস্তে আস্তে আড়ালটুকু ঘুচে যায়। সে সময়ে তাঁরা থাকতেন কলকাতার পার্ক সার্কাসে। একবার স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন 'স্টারে'। সাথে প্রথম পুত্র। পাশ থেকে ভেসে এল একটি ভাঙ্গা অথচ মিষ্টিগলার উচ্ছ্বসিত হাসি। তাকিয়ে দেখেন, বন্ধুদের নিয়ে সুমুখের দিকে আসছেন বিদ্রোহী কবি। ছেলেকে দেখে বলেন, এই বুঝি প্রিন্স অব ওয়েলস্? আর কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই হো হো হাসি এবং উচ্চ কণ্ঠে ভরে গেল রঙ্গমঞ্চের ভেতরটা।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি রাজী হলেন না। বললেন, আমি তাঁর আপন ভাগ্নে বৌ, আমার কাছ থেকে শেরে বাংলা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কি পেতে পারেন?

এ থেকই তাঁর মানসিক পটভূমি সম্পর্কে একটা ধারনা নেয়া যেতে পারে। অন্ততঃ গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর কবিতা লিখে আসছেন তিনি, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সংযতভাব। হয়ত আর একটা কারনেও তাঁর মনে অভিমানের ছায়া বিরাজ করছে। এতো বছর লিখেছেন তিনি, অজস্র কবিতা তাঁর ছাপা হয়েছে, অথচ কোন বই ছাপা হয়নি এযাবৎকাল। পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মৈত্রেয়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ লেখিকার তুলনায় মোটেও নিষ্প্রভ নয় তাঁর রচনা। অথচ নির্জন বাসে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছেম প্রবীণতমা এই মহিলা কবি।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, শুক্রবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯]

সমাপ্ত